দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে প্রণয়োপাখ্যান ধারা

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. রাজিয়া সুলতানা
অধ্যাপক (অবসরে)
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
এস. এম. মেহেদী হাসান
এম. ফিল. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে প্রণয়োপাখ্যান ধারা

Dhaka University Institutional Repository

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে প্রণয়োপাখ্যান ধারা

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhak University Library
467390
467390

তত্ত্বাবধায়ক
ড. রাজিয়া সুলতানা
অধ্যাপক (অবসরে)
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
এস. এম. মেহেদী হাসান
এম. ফিল. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এস.এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল ডিগ্রি লাভের নিমিত্তে "দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে প্রণয়োপাখ্যান ধারা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির কাজ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। আমার জানামতে গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

রাজিয়া সুলতানা

ড. রাজিয়া সুলতানা
অধ্যাপক (অবসরে)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ০২

প্রথম পরিচ্ছেদ ০৩
অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৬
দোভাষী পুঁথির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিচার এবং বিষয়ানুসারে শ্রেণীকরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩৬
প্রণয়োপাখ্যান ধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৭৭
দোভাষী পুঁথির প্রণয়োপাখ্যান ধারার রচনাশৈলী ও কবিকৃতি বিচার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯২
প্রণয়োপাখ্যান ধারার কাব্যসমূহে সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি।

মূল্যায়ন ও উপসংহার। ১০৫

১১১

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

দোভাষী পুঁথি সাহিত্যে প্রণয়োপাখ্যান ধারা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানব জীবনের অনুরণিত আবেগের শৈল্পিক উপস্থাপন হল সাহিত্য। সাহিত্যের অনুবর্তিত ধারায় প্রকাশিত হয় সমসাময়িক কালের সামগ্রিক জীবন-অভীক্ষা। রাজনৈতিক ইতিহাসের কালপটে বিম্বিত হয় বিজেতার কীর্তিগাথা ও পরাজিত শক্তির যাবতীয় কুৎসা। একরৈখিক দৃষ্টিকোণ নির্ভর এসব ইতিহাস-তথ্য যে কোন জাতির সামগ্রিক আদর্শের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। কালের সামাজিক-চেতনা ও আদর্শ শৈল্পিকরূপে অঙ্কিত থাকে একমাত্র সাহিত্যে। সে কারণে সাহিত্যকে বলা হয় কালের সামাজিক দলিল। সমসাময়িক কালের রাষ্ট্রিক ও ব্যক্তিক মানসিকতা ধরা পড়ে সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে। ক্ষমতাসীন শাসকের দৌরাত্ম্যে সমপর্যায়ে তাঁর সমালোচনা দুঃসাহসের শামিল। সমাজ-রাষ্ট্রের সচেতন সত্তা হিসেবে কবি সাহিত্যিকগণ প্রতিনিয়ত তাদের ক্ষোভ, স্বপ্ন ও জীবন-জিজ্ঞাসার আশ্রয় খুঁজে ফিরেছেন শিল্প সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রাচীন যুগের নিদর্শন চর্যাপদেও লক্ষ্য করা যায় ভিন্ন আদর্শের ব্যক্তি-আক্রোশে তাদেরকে বিতাড়িত হতে হয়েছে স্বীয়ভূমি হতে। যে কারণে রূপকাশ্রয়ী ভাবমূলক এসব কবিতায় উপমা ও রূপক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে বাস্তব জীবনের নানা অনুষঙ্গ। যাতে তৎকালীন সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত রাজন্য-পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট। তাছাড়া ধর্মীয় ভাবাবেগের একচ্ছত্র আধিপত্যে মানবীয় বিষয় তখনও সাহিত্যের উপকরণে পরিণত হয়নি। মূলত প্রাচীন থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্যায় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সমগ্র সাহিত্য ভান্ডার ছিল ধর্ম তথা দেব-দেবী নির্ভর। ইংরেজ শাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে যুক্তিপ্রবণ ও উদারনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু হঠকারী ইংরেজ শাসকদের ক্ষমতাকে মেনে নিতে পারেনি তৎকালীন মুসলমান সমাজ। ফলে নৈতিক আদর্শের শক্তিতে তারা ইংরেজ শাসকের যাবতীয় বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে ইংরেজরাও মুসলামনদের প্রতিপক্ষ হিসেবে কোণঠাসা করে রাখে। এসব পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজে নেমে আসে হতাশা, ক্ষোভ, আর্থিক অবনতি ও সমাজ বিচ্ছিন্নতা। যার ফলশ্রুতিতে নিপীড়িত মুসলমান সমাজ ইংরেজ শাসনামলে ঝুঁকে পড়ে ইসলামের পৌরাণিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য নির্ভর যুগধারার বাইরের ভাবাদর্শে। এ ক্রান্তিকালই হচ্ছে দোভাষী পুঁথি সৃষ্টির রহস্যের প্রেক্ষাপট।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

১. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

একটি জাতির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও জীবনাচরণ সংঘটিত হয় তার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে। দীর্ঘ সময় সহাবস্থানের কারণে সৃষ্টি হয় স্বতন্ত্র জাতিসত্তার। 'বাংলা' দেশের সৃষ্টি রহস্যেও রয়েছে তেমনি ইতিহাসের অনুসৃত ধারার ক্রমবিবর্তনের ধারাক্রম। খ্রিষ্টপূর্ব তিনহাজার (আনুমানিক) বছর আগে ঋগ্বেদের' "ঐত্যরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে 'বঙ্গ' নামে প্রথম এ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] তখন থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত 'বঙ্গভূমি বলতে 'বঙ্গ', পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, ব্রাহ্ম, সমতট, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি জনপদকে বুঝায়।[২] রাজা শশাঙ্কের পর হতে এই জনপদ 'গৌড়' নামে অভিহিত হয়। পুরাণে প্রাচ্য দেশের তালিকায় বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে।[৩] তাছাড়া কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে,' মহাভারতের 'দিগ্বিজয়' অংশে, ভীমের 'পুন্ড্র' থেকে বঙ্গদেশ সুপরিচিত দেশ। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি অধিকৃত এদেশের নাম ছিল 'বঙ্গভূমি' এবং এর রাজধানী ছিল 'লাখনৌতি' (লক্ষণাবতী)।[৫] মোগল আমলে এই ভূ-ভাগই 'মুরজ-ই-বঙ্গালই(সুবা বাঙ্গালা) নামে পরিচিত হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেন, 'বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে হুগলী জেলার সন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। "বঙ্গ" এবং "আল" (আইল বা উচু বাঁধ) থেকে "বাঙ্গাল" বা 'বঙ্গালাহ' নামে সৃষ্টি। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, 'প্রাচীনকাল হতে বঙ্গ' এবং 'বঙ্গাল' দুটি আলাদা দেশ ছিল। "বঙ্গাল" দেশের নাম হতেই কালক্রমে সমগ্র দেশের নামকরণ "বাংলা" হয়েছে। ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলের নাম হয় 'বেঙ্গল'। নীহাররঞ্জন রায় আবুল ফজলের মতকে স্বীকার করেছেন। 'বাঙালা' নামের প্রচলন ঘটে ইলিয়াস শাহর শাসনামলে। এ অঞ্চলে ছিল 'বং' গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। 'বং' গোষ্ঠীর নাম থেকে 'বাংলা', 'বাঙ্গলা', 'বাঙ্গলা' নামের উৎপত্তি। 'বং ' গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বাসভূমি বর্তমান ভাগীরথী নদীর পূর্বতীর থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল অঞ্চলই খর্বীকৃত

Dhaka University Institutional Repository

হইয়া 'পূর্ব বাংলা' গঠিত হইয়াছে।' এ অঞ্চলের মানুষের সার্বজনীন ভাষাকেই বলা হয়েছে 'বাংলা ভাষা'।

হিন্দু রাজা লক্ষণসেনকে বিতাড়িত করে তুর্কি বীর বখতিয়ার খিলজী ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে 'বঙ্গভূমিতে মুসলিম শাসনের (১২০১-১৫৫০) সূচনা করেন। প্রায় পৌনে তিনশ বছর[৯] বঙ্গ ভূমি তুর্কি ও আফগান শাসক কর্তৃক শাসিত হয়। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই[১০]

দাউদ খান কররানী মুঘল শক্তির নিকট পরাজিত ও নিহত হলে বাংলা মুঘল শাসনের অঙ্গীভূত হয়। দীর্ঘ উনিশ বছর পর মুঘল আধিপত্য সুনিশ্চিত হলে বাংলাকে 'মুঘল রাজত্বের একটি প্রদেশ বা সুবাতে পরিণত করা হয়। সুবার শাসন কর্তা হিসেবে নিয়োজিত করা হয় মুঘল শাসকের অনুগত সুবাদার বা গভর্ণর। মুঘল রাজবংশের ক্ষমতা দ্বন্দ্বের ও দুর্বলতার প্রেক্ষিতে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান নামে মাত্র সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত থেকে স্বাধীন নবাবী আমলের প্রচলন ঘটান।

মুর্শিদকুলি খানের পূর্বে বাংলার সুযোগ্য সুবাদার ছিলেন শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৭৮ ও ১৬৮০-৮৮), খান-ই- জাহান এবং আজিমউদ্দিন ওরফে আজিম-উশ-খান (১৬৯৭-১৭১২)। আওরঙ্গজেবের পৌত্র হওয়ার সুবাদে তিনি ছিলেন প্রজাউৎপীড়ক। তাঁর সময়ে মুর্শিদকুলি খান (১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলার দেওয়ান হয়ে আসেন। আজিম-উশ-শানের সময় প্রজা উৎপীড়ন ও ব্যক্তিগত ব্যবসার কারণে অচিরেই দেওয়ানের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়। সুবাদার মুর্শিদকুলিকে হত্যার পরিকল্পনা করেন এবং ব্যর্থ হন। দেওয়ান বিষয়টি সম্রাট আওরঙ্গজেবকে অবহিত করেন এবং প্রতিকার রূপে সম্রাটের অনুমতি ক্রমে 'দিওয়ানি বিভাগ' ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন। মকসুদাবাদের নতুন নামকরণ করে নিজের নামে 'মুর্শিদাবাদ।'

১৭০৭ খিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির সম্রাট হন বাহাদুর শাহ। শাহজাদা আজিমউদ্দিনকে তিনি বাংলা ও বিহারের সুবাদার পদে বহাল রাখেন। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

আজিম-উশ- শানের ক্ষমতার প্রভাব বেড়ে যায় এবং তাঁরই চক্রান্তে ১৭০৮ সালে মুর্শিদকুলি খানকে উড়িষ্যার দিওয়ান হিসেবে বদলী করা হয়। উত্তরাধিকার নিয়ে সম্রাট পরিবারে আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হয় যার প্রভাব বাংলার রাজনীতিকে অশান্ত করে তোলে। দুই বছর পর মুর্শিদকুলি আবার বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন (১৭১০)। এরপর ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার[১১] পদে নিযুক্ত হন। নাম মাত্র মুঘল বশ্যতা স্বীকার করে বাৎসরিক নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করে তিনি বাংলার স্বাধীন নবাব রূপে অধিষ্ঠিত হন। যা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে 'নবাবী আমল' হিসেবে স্বীকৃত।

মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারী হওয়ার সুবাদে বাংলা প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় মুঘল শাসনের বিশৃঙ্খলায় বাংলার সুবাদারি পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পরিণত হয়। যদিও স্থানীয় শাসকদের দমন করে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামল থেকেই।[১২] বাংলা সুবাদারীর তিনি ছিলেন বিচক্ষণ দেওয়ান। রাজস্ব বৃদ্ধি কল্পে তিনি নানা ধরনের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। জায়গীরদের প্রথা বিলোপ করে তা খাসে পরিণত করেন এবং তাদের উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। এতে করে এসব জমি সরকারী রাজস্বের আওতায় আসে। ভূমি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সমগ্র বাংলার ভূমি জরিপ করেন এবং ভূমির প্রকারভেদে খাজনা ধার্য করেন। সুশৃঙ্খলভাবে রাজস্ব আদায়ের জন্য বাংলা প্রদেশকে ১৩টি চাকলায় বা বিভাগে ভাগ করেন এবং প্রতি চাকলায় একজন ফৌজদার, আমিনসহ রাজ কর্মচারী নিয়োগ করেন।[১৪] তাঁর এ রাজস্ব সংস্কার বা শাল জামিনী ব্যবস্থায় পুরাতন জমিদারদের পতন ঘটে এবং ইজারাদাররাই নতুন জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করল। এরাই পরবর্তীতে মর্যাদা পেলে জমিদার, রাজা মহারাজা হিসেবে।[১৫] নতুন এই জমিদারদের বিকাশ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন- "এই নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারেরা প্রায় লুপ্ত হইল এবং নতুন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া দুই তিন পুরুষের মধ্যে রাজা, মহারাজা উপাধি পাইলেন। এই রূপে বাংলাদেশে নূতন এই হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।"[১৬] রাজস্ব সংস্কারের ফলে বাংলার রাজস্বের প্রভূত উন্নতি সাধিত হল এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার রাজস্ব ঘাটতি দূর হয়ে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত থাকে।[১৭] রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে ইজারাদাররা শুধু নির্দিষ্ট খাজনা আদায় করতে পারত। অতিরিক্ত কর আদায় বন্ধ হওয়ায় দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ থাকায় প্রজাদের খাজনা দেবার সামর্থ বৃদ্ধি পায়।

রাজস্ব আদায়ের তিনি খুব কড়াকড়ি আরোপ করেন। রাজস্ব আদায়ে তিনি হিন্দু ইজারাদারকে দায়িত্ব দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। মুর্শিদকুলি খান এর আমলে দ্রব্যমূল্য সুলভ হয় এবং টাকায় ৫/৬ মণ চাউল বিক্রি হত। তাঁর প্রশাসন এত বলিষ্ঠ ও সফল ছিল যে,সে সময় কোন বৈদেশিক আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হয়নি। ফলে,সামরিক খাতে খরচ প্রায় বন্ধই হয়ে পড়ে।[১৮] ১৭২৭ সালের ৩০ জুন মুর্শিদকুলি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুর্শিদকুলির কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি দৌহিত্র সরফরাজকে পুত্রবৎ পালন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার সুবাদারিতে উত্তরাধিকার করার জন্য সম্রাটের অনুমতি লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু মুর্শিদকুলির জামাতা সুজাউদ্দীনের বাংলার সুবাদারির প্রতি দৃষ্টি ছিল। উড়িষ্যার নায়েব নাযিম হিসেবে তিনিও সম্রাটের নিকট সুবাদারির জন্য আবেদন করেন এবং ফরমান প্রাপ্ত হন। ফলে বিনা বাধায় বাংলা- উড়িষ্যার মসনদ লাভ করেন। ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট তাঁকে বিহারের সুবাদারও নিয়োগ করেন। শাসন-সুবিধার জন্য তিনি প্রতিটি সুবায় একজন করে নায়েব নাযিম নিযুক্ত করেন। তিনি মুর্শিদকুলি খানের আমলে বন্দী জমিদারদের মুক্ত করেন। ফলে,তাঁর যশ অর্থ দুই বৃদ্ধি পায়। তিনি মুর্শিদকুলির 'মালজামিনী' ব্যবস্থা বজায় রাখেন। রাজস্ব বৃদ্ধি কল্পে তিনি 'নযরানা, মুকররবী, 'জরক্ষথট' 'মাথট ফিলখানা' ও 'ফৌজদারি আবওয়ার' নামক চার প্রকারের অতিরিক্ত কর জমিদারদের ওপর ধার্য করেন।[২০] তিনি রাজত্বের শেষ দিকে বিলাস-প্রিয় হয়ে পড়েন এবং শাসন ব্যাপারে মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। ফলে তাদের স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রের দরুণ রাজ্য মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত হয়। [২১] ইংরেজ বণিকদের উপর তিনি কড়া নজর রাখতেন। দুগলিতে বিদেশি বণিকদের উপর

Dhaka University Institutional Repository

ফৌজদার উচ্চহারে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা নিলে বণিকেরা এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শেষে ইংরেজরা নবাবকে তিন লাখ টাকা নজরানা দিয়ে সন্তুষ্ট করেন এবং বণিকেরা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের চেষ্টা করেন। তার শাসনামলে টাকায় ৮মণ চাউল পাওয়া যেত। শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকা দূর্গের পশ্চিম তোরণ দ্বার বন্ধ করা হয়েছিল। সুজাউদ্দীনের সময় তা আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয়। [২২]

নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর (১৭৩৯, ১৩ মার্চ) পর বাংলার মসনদের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁন। তিনি তাঁর পিতার মতো ভোগবিলাসী ছিলেন। দেশের শাসন কার্যে মনোযোগ না দিয়ে তিনি তাঁর হেরেমের ১৫০০ নারী [২৩] নিয়ে আনন্দ ফূর্তি করতেন। শাসক হিসেবে তাঁর দুর্বলতা এবং নতুন উপদেষ্টাদের কুমন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্রের দরুণ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে বিহারের নবাব আলীবর্দী খাঁ ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার মসনদ দখল করে।

আলীবর্দী মসনদে উপবেশন করে সুজাউদ্দীনের জামাতা উড়িষ্যার নায়েব নাযিমের বিরোধিতায় পড়েন। তার আমলে বাংলায় মারাঠা আক্রমণ অতিষ্ঠ করে তোলে। এরা 'বর্গী' নামে জনগণের কাছে পরিচিত ছিল। বর্গীরা 'চৌথ' আদায়ের নামে বাংলার মানুষের জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে। বর্গীর' আক্রমণ ও নির্যাতনে পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। অগত্যা নবাব মারাঠাদের সাথে শান্তি চুক্তি মোতাবেক উড়িষ্যা প্রদেশ দিয়ে দেন। তাঁর শাসনামলে প্রত্যেক অসহায় ও বিধবা উপকৃত হতেন এবং চোর-ডাকাত ছিল না বললেই চলে। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা- বিহার- উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। প্রথম থেকেই নবাব পরিবারের লোকজন তার শত্রু ছিল। ঘসেটি বেগম, শওকত জঙ্গসহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা তাঁর বিরোধিতা করেন। এছাড়া ইংরেজ বণিকেরা নবাবের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। ফলে মসনদে বসেই এদের মোকাবেলা

Dhaka University Institutional Repository

করতে অগ্রসর হন। প্রাথমিক কর্মকাণ্ড হিসেবে ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ আক্রমণ করেন। মীর জাফরকে সেনাপতি পদে পদচ্যুত করেন। [২৭] এতে করে তার প্রবীণ সভাসদরা অনেকেই রুষ্ট হন এবং নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন।

প্রাসাদের বাইরে নবাবের প্রধান শত্রু ছিল ইংরেজ বণিকরা। তারা অবাধে ও বিনা শুল্কে ব্যবসা করে প্রচুর সম্পদের মালিক হন এবং তাদের শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। নানাভাবে নবাবকে উপেক্ষা করতে থাকেন। অন্য বণিকরা নবাবের আদেশ মান্য করলেও ইংরেজরা নবাবের আদেশ আমান্য করে কলকাতায় দূর্গ নির্মাণ করেন।[২৮] এ কারণে নবাব তাদের কাশিম বাজার কুঠি ও কলকাতা দূর্গ দখল করে কলকাতা থেকে অপসারিত করেন। কলকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা নবাবের শত্রুর সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। এরপর মাদ্রাজ পরিষদের নিদেশে ১৭৫৬ খ্রিস্টব্দের ২৯ ডিসেম্বর তারা বিনা বাধায় কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। এভাবে নবাবের দুর্বলতা গৃহশত্রু ও বহিশত্রুর নিকট প্রকাশ পেয়ে যায়। পরবর্তীতে ইংরেজ ও কুচক্রীমহল উভয়ে মিলে নবাবকে সিংহাসন চ্যুত করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন এবং এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ফলে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন[২৯] পলাশী প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটে। তাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন নবাবী আমলের অবসান ঘটে এবং জাতীয় জীবন সংগঠনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলায় ইংরেজদের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয় এবং এখানে বিদেশী শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পলাশী যুদ্ধে বিজয়ের পর সন্ধি চুক্তি অনুসারে বাংলার নবাব হন মীরজাফর (১৭৫৭-৬০)। কোম্পানির ক্রমাগত অর্থ-চাহিদার প্রেক্ষিতে তাঁর নবাবী পরিচালনা কষ্টকর হয়ে পড়ে। অচিরেই লর্ডক্লাইভ কর্তৃক মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হন। মীর কাসিম (১৭৬০-৬৩) নবাব হয়ে বাংলার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং কোম্পানিকে দেয় সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন। মীর কাসিম কোম্পানিকে প্রভুর ভূমিকা থেকে সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ীর পর্যায়ে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালান[৩০] এবং ইংরেজদের কর্তৃত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর করেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীদের অবাধ শোষণ বন্ধ করতে গিয়ে তিনি রাজ্যচ্যুত হলেন। মীরজাফর আবার নবাব হলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। এরপর তাঁর পুত্র নাজিমউদদৌলা (১৭৬৫-৬৬) কে নবাবীতে আসীন করলেন ইংরেজরা। তারপর নবাব হলেন মীরজাফর - পুত্র সাইফউদ্দৌলা; তাঁর মৃত্যুতে মীর জাফরের তৃতীয় পুত্র মুবারকউদদৌলা নিযুক্ত হলেন বাংলার নাজিম পদে।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় নবাবের রাজত্ব শেষ না হলেও ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভ হল।[৩১] ১৭৬৫ তে সম্রাট শাহ আলমের নিকট হতে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। অল্প কয়েক বছরেই কোম্পানী বিপুল রাজস্ব আদায়ে সচেষ্ট হয়। দেওয়ানি লাভের পর এদেশে ক্লাইভের দ্বৈত শাসন চালু হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কুফলের হেতু বিলেতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এদেশের শাসনভার ইংরেজ কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত করে এবং ওয়ারেন হেস্টিংসকে (১৭৭২-১৭৮৫) বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠায়।[৩২] তারপর গভর্ণর জেনারেল হল লর্ড কর্ণওয়ালিস, তিনি ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করেন। সৃষ্টি হয় নতুন জমিদার শ্রেণীর। সেকালে বাংলার কৃষি ও শিল্পের অবস্থা উন্নত থাকলেও কোম্পানীর কর্মচারীদের শুল্কবিহীন বাণিজ্যে এদেশীয় কৃষি ও শিল্প ধবংস হতে থাকে। সাধারণ রায়তের উপর কোম্পানির অত্যাচার বেড়েই চলল। ইংল্যান্ডের আমদানিকৃত তৈরী জিনিসের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে দেশীয় শিল্প ধবংস হতে থাকল। বাংলার মানুষের শোষণকৃত রাজস্বের বেশির ভাগ অর্থ বিলেতে পাচার হতে থাকল। কোম্পানীর কর্মচারী গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও অত্যাচারে দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়তে থাকে।[৩৩] ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৩৪] ১৭৭৫ সনে দ্বৈত শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৮০তে দ্বৈতশাসন বিলুপ্ত হয় এবং প্রশাসনে দেশীয় কর্মকর্তা অপসারণ করে সম্পূর্ণভাবে শ্বেতাঙ্গীকরণ করা হয়। দেশের জনসাধারণের দুর্দশা

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি পেতে থাকে কোম্পানীর বিভিন্ন রাজস্ব সংস্কারের ফলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সমুদয় দেশীয় পুঁজি ভূমিতে বিনিয়োগ হল। ফলে নতুন করে সৃষ্টি হল ইংরেজ অনুগত এক শ্রেণীর জমিদারের। ইংরেজ শাসনামলের সূচনায় কিছু বিদ্রোহ হলেও তা ছিল কিছু অভিযোগ কেন্দ্রিক, যেমন- ১৭৬৫তে বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহ। তবে ফকির সন্ন্যাসীদের (১৭৬০ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত) বিদ্রোহ কোম্পানীকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কারণ, তারা নিয়মিত শক্তি পরীক্ষায় কোম্পানির সাথে লিপ্ত হত। সাংগঠনিক দুর্বলতার উনিশ শতকের গোড়াতে ফকির সন্ন্যাসীদের কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয়।

২. সামাজিক প্রেক্ষাপট

মুঘল শাসনামলে বাংলার সাথে উত্তর ভারতের যোগাযোগের স্থাপিত হয়। মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলার সুবাদার দেওয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীরা সুশাসকও প্রজাবৎসল ছিল। ফলে প্রজারা সুখে শান্তিতে ছিল এবং তাদের জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে নিযুক্ত কর্মচারীরা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী। তাদের সভাসদরা ছিলেন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। তাদের প্রভাবে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবজীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাছাড়া ফরাসি রাজভাষার কারণে এ ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিরা অনায়াসে রাজ-কর্মচারী হিসেবে চাকরী পেতে থাকে। মুঘল সমাজের রীতিনীতি সমাজকে প্রভাবিত করে। নবাবী আমলে বাংলা শিক্ষা দেয়া হত পাঠশালায় আর সংস্কৃত পাঠ দেয়া হত চতুষ্পাঠীতে। নবাবদের অধীনে অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। এ সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর ফারসির যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। মুসলমান কবিরা ফারসি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাবধারা অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। বাংলায় সুফী মরমীয়াবাদে বাউল ও ফকিরি দরবেশ শিয়া মতবাদের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার প্রসারে ১৭৮০তে কলকাতা মাদ্রাসা, এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪), সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় বাংলার হিন্দু সমাজেও বিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

আসে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং হিন্দু গোঁড়ামীর মূলে পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

নবাবী আমলে পতনের পর উচ্চ পদ থেকে উচ্চবিত্ত মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয়। তাদের যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে ইংরেজ আধিপত্যের সূচনালগ্নে তারা ভাগ্যান্বেষণে বাংলাদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। নবাবী আমলে অভিজাত মুসলমানদের উপার্জনের পথ ছিল সামরিক পদে যোগদান, রাজস্বভোগ এবং বিচার ও রাজনৈতিক নিয়োগ। কোম্পানী আমলে শাসন সংস্কারের ফলে এরা চাকুরিচ্যুত হন। কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের কয়েক বৎসর এদের আধিপত্য বজায় থাকলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হবার পর তাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠল।

মুঘল আমলে বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। উদ্বৃত্ত কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য ব্যাপকভাবে বিদেশে রপ্তানি হত। ব্যাপক রপ্তানির ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মুঘল যুগে বাংলাদেশ ছিল মূলত কৃষি প্রধান। লোকসংখ্যা কম থাকায় জমির উর্বরতা ও পরিমাণের কারণে খাদ্য সংকট ছিল না। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, বাংলার উদ্বৃত্ত চাল উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, সিংহল ও মালদ্বীপে রপ্তানি হত; মুর্শিদকুলী তাঁর শাসনামলে সপ্তাহে দুইদিন বিচার কার্য করতেন এবং সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করতেন। তিনি অত্যাচারীকে এমন কঠোর শাস্তি দিতেন যে কেউ অত্যাচার করার সাহস পেত না। অতি সাধারণ প্রজাও অত্যাচার থেকে নিরাপত্তা পেত। সুজাউদ্দীনের শাসনামলে ভয়ার্ত প্রজারা নির্বিঘ্নে তাঁর নিকট আশ্রয় নিতে পারত। তাছাড়া তাঁর সময়ে টাকায় ৮মন চাউল পাওয়া যেত। অন্যান্য জিনিসের দামও খুব সুলভ ছিল। নবাব আলীবর্দীর সময় রাজস্বের হার পরিমিত থাকায় জমিদাররা কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করেন। জমিদাররা যাতে প্রজা উৎপীড়ন করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এ সময় তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করেন। ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষে বাঙালির গুণ ও প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নবাব আলীবর্দী তাঁর আমলে অনেক হিন্দুকে শাসনকার্যের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করতেন।

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ও বিপুল রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে বাংলা ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলেও ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তেমন পরিবর্তন ঘটে নি। সমাজের সর্বস্তরে ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা চলছিল। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নানাবিধ আচরণ একে অপরে গ্রহণ করেছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মান্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় শিশু সন্তান বিসর্জন, বিধবা বিবাহ নিষেধ, কৌলিন্য প্রথার বিষময় ফল জনসাধারণ ধর্মের অঙ্গ বলে গণ্য করত। স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় হলেই তাদের বৈধব্য দশা ঘটবে এই বিশ্বাসে তাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হত। উভয় সম্প্রদায়ে ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের কঠোর পর্দার ব্যবস্থা নির্বিচারে অনুসৃত হত। হিন্দুদের দুর্গাপূজা জাঁকজমক, নৃত্য-গীত ও পান ভোজনের উপলক্ষ মাত্রে পরিণত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি ধর্ম বিষয়েই আবদ্ধ ছিল। হিন্দু-বিবাহের অনেক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল। কোন কোন মুসলমান সম্প্রদায়ে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় ছিল।

শিক্ষাবিস্তারে উইলিয়াম কেরী ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এদেশে এসে এক বছরের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফর ইংরেজদের প্রায় তিন কোটি টাকা দিয়েছিলেন; মীর কাশিমও অনেক অর্থ দিলেন। অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের পর নয় বছরের মধ্যে ইংরেজ কমর্কচারীরা অন্তত পাঁচ কোটি টাকা হস্তগত করে। দেওয়ানি লাভের পর মোট রাজস্ব

Dhaka University Institutional Repository

হতে শাসন সংক্রান্ত খরচ বাদে বাকি অর্থ দিয়ে এদেশের পণ্য কিনে কোম্পানি বিলেতে পাঠাত এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ সেখানেই থাকত। মোটি কথা কোম্পানী বিনা মূলধনে লাভের ব্যবসা পরিচালনা করত। তাছাড়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা অবসর গ্রহণের পর বহু টাকা বিলেতে নিয়ে যেতেন। ক্লাইভের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ টাকা এবং তার জমিদারির বাৎসরিক আয় ছিল দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। এভাবে কোটি কোটি পাচার করে বাংলার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল ইংরেজ কোম্পানী।

ইংরেজ শাসন কায়েমের কিছুকাল পরে ইংল্যান্ডে শিল্পের নবযুগ শুরু হয়। বাংলাদেশ থেকে তারা যে বিপুল অর্থ ইংল্যান্ডে নিয়ে যায় তাকেই মূলধন করে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদিত কাপড়ে বাজার ছেয়ে গেল। হস্তচালিত তাঁত শিল্প অচিরেই ধবংস হতে লাগল। তাছাড়া রাজকীয় ক্ষমতা অপব্যবহার করে নানা উপায়ে বাংলার কুটির শিল্প ধবংস করে বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্যের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি হয়েছিল।

ইংরেজ আমলে বাংলায় সংঘটিত হয় এক মহাবিপর্যয়ের। ক্রমাগত ইংরেজ কর্মচারীদের শোষণ ও একচেটিয়া ব্যবসায় দরুণ কৃষির প্রতি অবহেলা সূচিত হয়। এ বিষয়ে তৎকালীন নায়েব নাযিম রেজাখান সতর্ক করলেও ইংরেজরা তাতে কর্ণপাত করেনি। ১৭৬৮ সালে বৃষ্টির অভাবে ভাল ফসল হল না। পরের বছর আট মাস বৃষ্টি না হওয়াতে দীর্ঘ খরায় মাঠ, ঘাট সব শুকিয়ে গেল। ১৭৭০ সনের গ্রীষ্মে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। চালের বাজার অস্থিতিশীল করতে কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তারা অধিক মুনাফার জন্য মজুদ করল। খাদ্যাভাবে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা গেল। তবুও মহাদুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও আমিলগণ রাজস্ব সংগ্রহ থেকে রায়তদের মওকুফ করেনি। আমিলদের অত্যাচারে মানুষ বাস্তভিটা ছাড়তে বাধ্য হয়।

রেশম ও তাঁত শিল্প ছিল বাংলা গর্ব। দুর্ভিক্ষের ফলে রেশম ও তাঁত শিল্পে নিয়োজিত সমস্ত শ্রমশক্তির অর্ধেক লোক মারা যায়। এর ফলে রেশম ও বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন কমে

Dhaka University Institutional Repository

যায় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। দুর্ভিক্ষের ফলে দেশে মারাত্মকভাবে অপরাধ বেড়ে যায়। সমগ্র পরিবেশ এতটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল যে শক্তি ও হিংস্রতাছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

নবাবী আমলে সুফী প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ ইরানে সাহাভী বংশের পতন ঘটলে বহু ধর্মতাত্ত্বিক ও সুফী সাধকেরা বাংলায় আশ্রয় লাভ করে। এদের প্রভাবে বাংলার সর্বত্র সুফী ভাবধারা প্রচার হতে থাকে। এ সময় বাংলার নবজাগরণে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩১) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সমাজের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এবং সমাজ উন্নয়নে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন।

৩. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

উনবিংশ শতাব্দির সূচনালগ্নে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ভারতবর্ষকে ধীরে ধীরে করায়ত্ত করতে থাকে। নানা উপায়ে এদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ধবংস সাধিত হয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচার ও শোষণে দেশীয় পর্যায়ে অবক্ষয়ের মাত্রা বাড়তে থাকল। তখনও মানুষের মধ্যে দেশ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে কোন চেতনা সৃষ্টি হয়নি। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মভিত্তিক আচার অনুষ্ঠানই ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তি। জনগণের প্রাকৃতিক নেতা ছিল উভয় সম্প্রদায়ের আধ্যাত্ম ব্যক্তিরা। তাদের অবাধ ও স্বাধীন জীবনের প্রক্রিয়া মোঘল আমলে সরকারের নীতিভুক্ত ছিল। ইংরেজ আমলে তাতে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে আধ্যাত্মিক গুরুর কর্মকাণ্ডে ব্যাধা স্বরূপ স্থানিক পর্যায়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সূচিত হয়। উত্তর বঙ্গের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০) তার প্রথম প্রমাণ। পরবর্তীতে, রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩) ছিল জমিদার শোষণ থেকে বাঁচবার লড়াই। মহাদুর্ভিক্ষের সময়ও এ অঞ্চলে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছিল। জমিদারের শোষণ ও অত্যাচার থেকে বাঁচতে রায়তেরা সংঘবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এছাড়াও বলাকী শাহর বিদ্রোহ (১৭৯১-৯২), আগামোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

রেজার বিদ্রোহ (১৭৯৯), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৭-৮৭) ইংরেজদের ভাবিয়ে তোলে। ইংরেজ বাহিনী কঠোর হস্তে এসব বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮১৩ তে বিশেষ সনদ বলে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বন্ধ করা হয়। তবুও ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যে এতটুকু ভাটা পড়ে না। ১৮৩৩ তে কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষমতা পুরোপুরি বিলোপ হলেও তারাই বিভিন্ন উপায়ে বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসার করতে লাগল। ১৭৯৩ থেকে ১৮২৮ এই সময়ে লাখেরাজ সম্পত্তি বিশেষ আইন বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাছাড়া ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পে প্রয়োজন পড়ে 'নীল' এর। নীলের লাভজনক অবস্থা বিবেচনা করে অচিরেই গড়ে ওঠে নীলকর নামে এক বিশেষ শোষক গোষ্ঠী। ১৭৭২ সনে চন্দন নগরে প্রথম নীল চাষ শুরু হয়। ক্রমেই ইংরেজ কোম্পানী ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা দেশের বিভন্ন স্থানে নীলকুঠি স্থাপন করে এবং এদেশীয় চাষীদের নানা উপায়ে নীল চাষে বাধ্য করে। অল্প সময়ের মধ্যে বাংলায় গড়ে ওঠে প্রায় তিনশ চারশ নীলকুঠি। ১৮১৯-২০ থেকে ১৮২৬-২৭ সনের মধ্যে প্রতি বৎসর কোম্পানী প্রায় ১০/১২ লক্ষ টাকা লাভ করতেন। নীল চাষে রাজি না হলে রায়তদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হত। বাংলার নীল চাষীগণ অর্ধশতাব্দী নীলকরদের অত্যাচার সহ্য করলেও ১৮৫৯-৬০ তারা চরম বিদ্রোহ করল। বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মধ্যদিয়ে ১৮৬৮ তে নীল চুক্তি আইন রদ করা হল। ১৮৯২ সনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল প্রস্তুত হবার ফলে বাংলায় নীল চাষ বন্ধ হয়ে গেল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, তারাই ধীরে ধীরে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের অনুভবে এদেশে নানা প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে। ইংরেজ প্রশাসন শ্বেতাঙ্গীকরণের ফলে দেশীয় কেউ উচ্চপদে চাকুরি করতে পারেনি। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে দেশীয়রা এ সুযোগ লাভে সমর্থ হল। ১৮৩৫ সনে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি অনুমোদন লাভ করে এবং ইংরেজি জানা ব্যক্তিরাই সরকারি চাকুরি পাবার অধিকার পায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাবে এ সময় যুক্তিবাদী উদারনৈতিক ও স্বাধীনসত্তার শিক্ষার্থীর উন্মেষ ঘটে। পাশ্চাত্য দর্শন, রাজনীতি ও জ্ঞানের প্রভাবে তারা সমসাময়িক সবকিছুর বিরোধিতা করে। আমেরিকার স্বাধীনতা, সমর, ফরাসি বিপ্লব, এবং ১৮৩০ সনের ইউরোপীয় রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিষয়ে তারা জানত এবং স্বাদেশিকতার সার্বভৌমে উজ্জীবিত হয়েছিল। ১৮২৩ সনে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে যে প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রচলিত হয় রামমোহন ও তার সহযোগীরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মগত পার্থক্য হেতু প্রচলিত অর্থে জাতীয়তাবাদের কোন ধারণাই ছিল না। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, স্থানীয় শাসন প্রবর্তন ও আইন ব্যবস্থার ফলে ক্রমশ ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শে তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। বাংলার এই নবজাগরণে পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩২)। আধুনিক শিক্ষার আলোকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার বিবর্জিত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। সতীদাহ প্রথা রোধ তাঁর অনন্য সমাজ সংস্কার। তিনি হিন্দু ধর্মের গতানুগতিক চিন্তাধারা ও আদর্শের পরিবর্তে একেশ্বরবাদী 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। যা ঊনবিংশ শতকে ভারতীয়দের প্রগতিশীল আন্দোলনের খোরাক যুগিয়েছিল।

১৮৩৩ সনে চার্টার আইনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণবৈষম্য পরিহার করে কোম্পানীর উচ্চপদে এদেশীয়দের নিয়োগ দেয়া হয়। ১৮৫৩ সনে লর্ড মেকলের প্রচেষ্টায় চাকরিক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রথা চালু হয়।

ইংরেজ শাসনে বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিরা মাঝে মাঝেই স্বাধীনতা সংগ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে কেউ নেতৃত্ব দিলে সকলে আকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন

Dhaka University Institutional Repository

ছিল আঞ্চলিক সশস্ত্র প্রতিরোধ, অন্যদিকে চলছিল কেন্দ্রীয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের জল্পনা কল্পনা। বঙ্গে ইংরেজ সেনা বাহিনী বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা আইন পাস (১৮০০) তারই প্রমাণ বহন করে।

১৮৪৩ সনে জর্জ টমসন কলকাতায় নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান Bengal British India Society গঠন করেন;সবার ন্যায্য অধিকার ও দাবি প্রতিষ্ঠাই ছিল এর লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম ভারতে জনমত গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

১৮৪৯ সনে আইন সদস্য মি. বেথুন ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিবিধানে "কালো আইন" সংশোধনের খসড়া তৈরি করেন। এর ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা অনুভব করে ইংরেজরা এই বিলের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনে মেতে ওঠে। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে বিলটি প্রত্যাহার করে।

১৮৩৩ সনের সনদকে ঘিরে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। তাদের স্বাধিকার ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট জানানোর প্রয়োজনে ১৮৫১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন'। শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মিলন-ভূমি ছিল এ সংগঠন। রাজনৈতিক ক্ষমতাবন্টন ও অর্থনৈতিক কারণে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে চরম হিংসা ছিল। ফলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার্থে ১৮৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান এসোসিয়েশন'। ১৮৫৮ সনের অনেক আগে থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে বাঙালি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীরা। ১৮৫৬ সনে ডালহৌসির স্থলে লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২) গভর্নর হওয়ার এক বছরের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। যার কারণ ছিল শত বৎসর ব্যাপী ইংরেজ শাসনের কুফল । তদুপরি এনফিল্ড রাইফেলের টোটায় শুকর ও গরুর চর্বির ব্যবহারের গুজবে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর

Dhaka University Institutional Repository

শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা দেয়। নেতৃত্বহীন সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৮ সনে পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসন পরিচালনার ক্ষমতা চিরদিনের মত লোপ পেল। ১৮৫৮ সনের ২ আগস্টে প্রণীত আইন অনুসারে বৃটিশরাজের হাতে ভারত শাসনের ভার ন্যস্ত হল। তাতে ইংরেজ বণিকদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন ঘটল না। মহারাণীর শাসনের দু বছরের মাথায় ভারতের আমদানী অনুযায়ী অপরিমিত অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার হতে লাগল।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল ভারতীয়দের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়েছিল। সরকার বৃটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বিবেচনা করে আমদানি শুল্ক উঠিয়ে দেয় এবং ভারতীয় পণ্যে অতিরিক্ত কর ধার্য করে এবং অবাধ বাণিজ্যনীতি আরোপ করে দেশীয় শিল্প প্রসারের পথ বন্ধ করে দেয়। এসময় নীলকরদের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেল। সরকারী উচ্চপদে প্রতিযোগিতার বয়স ২৩ থেকে কমিয়ে ১৮৭৭ সনে উনিশে ধার্য করা হল। যাতে করে এদেশীয় কেউ উচ্চপদে নিযুক্ত হতে না পারে।

৪. সামাজিক প্রেক্ষাপট

ইংরেজ রাজত্বে এদেশের কৃষি দারুণভাবে অবহেলিত হয়েছিল। ফলে সুষ্ঠু তদারকির অভাবে খরায় বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে ব্যাপক হারে প্রাণহানি ঘটত। এ সময় বাংলার গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙন সৃষ্টি হল। পুঁজিবাদের বিকাশে নতুন অর্থ ব্যবস্থায় শহর সৃষ্টি হতে থাকল। অনেকে কৃষি থেকে শহরমুখী হয়ে ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ল। শহরকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে অচিরেই তারা ইংরেজ প্রশাসনে যুক্ত হতে থাকল। সৃষ্টি হল অর্থনৈতিক কাঠামোর নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস।

পূর্ব ঐতিহ্য অনুসারে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকল। বিচ্ছিন্নতার ফলে অচিরেই তারা উন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অপর দিকে হিন্দু সম্প্রদায় আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উচ্চপদে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি এবং বৃত্তি প্রদানে মেধার মূল্যায়ন ধার্য হলে মুসলমান সমাজ আরো পিছিয়ে পড়ে। ১৮৫৪ সনের ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কলকাতা, মাদ্রাজ, ও বোম্বাই শহরে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা, কারিগরী শিক্ষা প্রদান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুদান, উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি মাধ্যম ও প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ব্যবস্থা নেবার সুপারিশ করা হয়।

১৮৭৩ সনের শেষে মোট প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের পরিমাণ ছিল আট লক্ষ টাকা। ১৮৯৬-৯৭ সনে শিক্ষা বিভাগের চাকুরীর নতুন ব্যবস্থা হয়। উচ্চতর বিভাগের নাম হয় 'ভারতীয় শিক্ষা বিভাগ' ও নিম্নতর বিভাগের নাম হয় 'প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ'। এসব বিভাগে অচিরেই এদেশীয়দের চাকুরী লাভের সুযোগ ঘটল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাদারিয়া পন্থী সাধকদের বিদ্রোহ ইংরেজ রাজত্বে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে পাগলপন্থী বিদ্রোহের (১৮-২৫-৩৩) সৃষ্টি হয়। ১৮৩১ সনে তিতুমীরের বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনামলের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র সংগ্রাম। মূলত মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠিত করার মানসে একতাবদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়াও ফরায়েজী আন্দোলন, দুদুমিয়ার বিদ্রোহ ও ১৮৫৫ এর সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সকল বিদ্রোহ ইংরেজ সরকার কঠোর ও নৃশংসভাবে দমন করে।

গ্রামের তুলনায় শহরে জীবনযাত্রার উপায় সহজলভ্য হওয়ায় মানুষ শহরমুখী হল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুকূল্যে শহরে একটি নিম্ন-মধ্যবৃত্তির উদ্ভব ঘটল। কারখানা শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে শহরে শ্রমিক মজুরের সংখ্যা বাড়তে থাকল।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫১ সনে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যাধিক্য ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ইংরেজদের প্রতিযোগিতা ও অত্যাচার বাংলার শিল্প ধ্বংসের প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৫ এ যেখানে দেশীয় একটি সুতোর কল, কয়েকটি পাটকলও কয়লার খনির কাজ শুরু হয়; সেখানে ১৮৮০তে ৫৬টি কয়লা খনি, ১৮৮২তে ইংরেজ মালিকানাধীন ৫৬টি সুতোর কল গড়ে ওঠে।

শিল্প বাণিজ্য ধবংস হবার ফলে সাধারণ শ্রেণীর অনেক লোক জীবিকা অর্জনে কৃষিতে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পূর্বের বৎসর (১৭৬৪-৬৫) রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮১,৭০,০০০ টাকা। অথচ দেওয়ানি লাভের ১০ বৎসরের মাথায় রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২,৮১,৮০,০০০ টাকা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে আবদুল ওহাব নাজাদ আরবে ইসলামের অকৃত্রিম আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন, ইতিহাসে তার নাম 'ওহাবী আন্দোলন'। ১৮০৩ সনে মক্কার রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে ওহাবীরা। পরে তারা ক্ষমতাচ্যুত হলেও ধর্মসংস্কার থেমে থাকেনি। মক্কায় হজ উপলক্ষে ওহাবীদের প্রত্যক্ষ সংশ্রবে আসেন উত্তর ভারতের ধর্মনেতা সৈয়দ আহমদ, পূর্ব বাংলার ফরায়েজী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ, ও পশ্চিম বাংলার ফরায়েজী নেতা নাসির আলী (তিতুমীর)।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ইংরেজ শাসিত ভারতকে 'দারুল হরব' মনে করতেন। ইসলামের নানাবিধ সংস্কারের মধ্য দিয়ে তাঁরা স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে আর্থিক সংগ্রামে লিপ্ত হত। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র দুদুমিয়ার নেতৃত্বে এর প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে অক্ষুণ্ন থাকে। পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা ও নদীয়ায় সংস্কার পরিচালনা করেন নিসার আলী তিতুমীর। সংস্কার সাধনে জমিদারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় এবং স্থানীয় ভাবে বাঁশের কেল্লা ' বা স্বাধীন সরকার গঠন করে; এতে ইংরেজরা বিচলিত হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

সিপাহী বিপ্লব, ও ওহাবী আন্দোলনের পর উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। যা আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিত। ইংরেজ মুসলমানের পারস্পরিক সংশয় সন্দেহের টানাপোড়নে প্রতিনিয়ত ইংরেজ শাসক ও শাসিত মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ সময় নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী ও সালাউদ্দীন খোদাবকশের মতো ব্যক্তিরা সম্পর্ক উন্নয়নে এগিয়ে আসেন।

রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ সময় বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখক সৃষ্টি হতে পারেনি। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সাহিত্যে নতুন নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি হয়। পুরোনো পদ্য ও ধর্মশাসিত গতানুগতিক ধারার বদৌলতে সাহিত্য জগতে আবির্ভাব ঘটে দীনবন্ধু মিত্রের (নীল দর্পন ১৮৬০)।

অক্ষয় কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীন চন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, শেখ আবদুর রহীম, দাদ আলী, মোজাম্মেল হক, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও এস ওয়াজেদ আলী। ইংরেজ শাসন কায়েমের সার্থক ফলাফল ছিল এদেশীয় জনগণকে আধুনিক মনস্কতায় উজ্জীবিত করা। নবাবী আমল পতনের পর থেকে মুসলিম সমাজের প্রতিপত্তি কমতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে তাদের অবস্থা আরো কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অতীত কাতরতায় মুসলিম সমাজ নিবদ্ধ হয়। তারা ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যমূলক রোমান্স কাহিনী কাব্যের অনুকরণে অলৌকিক, কল্পনা প্রবণ ও দোভাষী (আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, তুর্কি) মিশ্রিত কাব্য রচনায় ব্রতী হন। যা বাংলা সাহিত্যে ইসলামী বাংলা, মুসলমানি বাংলা, মিশ্ররীতির কাব্য, দোভাষী পুঁথি নামে অভিহিত করা হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের যুগক্ষণে এ ধারার কাব্য সৃষ্টির প্রধান কারণ ছিল ইংরেজ

Dhaka University Institutional Repository

আমলে মুসলমানদের প্রতি চরম অবহেলা ও অস্তিত্বহীনতা। ফলে, উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা এ ধারার কাব্য রচনা ও উপভোগে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। ছাপাখানার বদৌলতে দোভাষী পুঁথি সারা বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর কাল পর্বেও গ্রামীণ সমাজ-মানসের রসপিপাসা নিবৃত্ত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ সব পুঁথি ছাপানো ও প্রচারে কলকাতার বটতলা ও ঢাকার চক বাজারের কেতাবপট্টি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তথ্য নির্দেশ:

১. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য- পৃ. ৯

২. ড. এনামুল হক- পূর্বোক্ত- পৃ.- ১

৩. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য- বাংলাদেশের ইতিহাস, নতুন সংস্করণ ১৯৯৭, ঢাকা- পৃ. ২৭

৪. পূর্বোক্ত- পৃ. ২৯

৫. ড. আবদুল করিম- বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ পৃ. ৮১।

৬. ড. আবদুল মোমিন ও অন্যান্য- পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৭. ড. এনামুল হক- পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

৮. আবদুল মোমিন-পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

৯.* ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

১০. আবদুল করিম- বা. ই (সুলতানী) আমল, পৃ. ৪৮৯

১১. Jadunath sarkar- History of Bengal, Volume-2, Dhaka University, 1948,page 399

১২. Jadunath Sarkar- History of Bengal, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

১৩. কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়- বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল, দ্বি সং, স্টুডেন্টস লাইব্রেরী কলকাতা, ১৩১৫ পৃ. ৮৫।

১৪. কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়- বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল, দ্বি সং, স্টুডেন্টস। লাইব্রেরী কলকাতা, ১৩১৫ পৃ. ৮৫।

১৫. Jadunath Sarkar- History of Bengal, পৃ. ৪০৯।

১৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার- পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।

১৭. ড. আবদুল মোমিন ও অন্যান্য-পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০।

১৮. মুহাম্মদ ইনাম-উল- হক—বাংলার ইতিহাস ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা পর্ব, পৃ. ২২

১৯. ড. আবদুল মোমিন ও অন্যান্য- পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩।

২০. কালী প্রসন্ন- বাঙ্গালার ইতিহাস- পৃ. ১০৪।

২১. ড. আবদুল মোমিন- পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭।

২২. পূর্বোক্ত- পৃ. ২৮৬।

২৩. Jadunath Sarkar–Ibid, পৃ. ৪৩৫।

২৪. ড. আবদুল মোমিন ও অন্যান্য পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭।

২৫. Ibid, পৃ. ৪৬০।

২৬. Ibid, পৃ. ৪৭০।

২৭. Ibid পৃ. ৪৭০।

২৮. রমেশ চন্দ্র মজুমদার-পূর্বোক্ত- পৃ. ১৬৫।

২৯. Sarkar-Ibid, পৃ. ৪৯০।

৩০. ড. আবদুল মোমিন-পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২।

৩১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার- পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

৩২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার- পূর্বোক্ত, পৃ. ৫।

৩৩. ড. আবদুল মোমেন ও অন্যান্য- পৃ. ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. ড. আবদুল মোমেন ও অন্যান্য- পৃ. ৩৪৯।

৩৫. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

৩৬. ড. ইনামউল হক- পূর্বোক্ত,পৃ-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোভাষী পুঁথির সংজ্ঞা, প্রকৃতি, গুরুত্ব বিচার ও বিষয় অনুসারে শ্রেণীকরণ

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের শেষ ভাগে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক পরিসরে উদ্ভব হয়েছিল পুঁথি সাহিত্যের। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা পাবার পর থেকে হিন্দু মুসলমানের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির পার্থক্যের প্রেক্ষিতে হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি হয় কবিগান ও মুসলমানদের পুঁথি সাহিত্য। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবি ফারসি শব্দমিশ্রিত বিশেষ ভাষারীতির যে সব কাব্য রচিত হয়েছিল, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পুঁথি সাহিত্য নামে অভিহিত। মধ্যযুগের পরিধি ১২০০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত বিবেচনা করা হলেও ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। মধ্যযুগের অপসৃতপ্রায় ও আধুনিক যুগের সমাগত পর্যায়ে উদ্ভব ঘটে দোভাষী পুঁথির। মূলত ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পরই দোভাষী পুঁথির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। প্রসঙ্গত ড. এনামুল হক বলেছেন-

> 'দোভাষী বাংলা বা মুসলমানী বাংলা ইংরেজ আমলের সৃষ্টি, তথ্যটি সঠিক নয়। বৃটিশ শাসনের পূর্বেই অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরুর ৩৭ বছর পূর্বে এর উৎপত্তি।'[১]

অপরদিকে ড. গোলাম সাকলায়েন বলেছেন-

> "এই কাব্য ধারায় প্রথম কবি ফকির গরীবুল্লাহ 'সোনাভান কাব্য' লেখেন ১১২৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭২০ সালে।"[২]

তবে এর বিকাশ ও বিস্তারকাল হল ইংরেজ শাসনামল। ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পর অভিজাত মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। উচ্চ পদ থেকে ইংরেজরা মুসলমানদের বিতাড়িত করতে থাকে। ফলে মুসলিম কবিরা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে উৎকৃষ্ট কাব্য থেকে দূরে সরে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে এদেশীয় জনসাধারণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। সুস্থ জীবনবোধ এ সময়ে বিদ্যমান ছিল না। নিম্নরুচির জনগণে রসপিপাসা নিবৃত্ত করতে গিয়ে কাব্যধারা অধোগামী হয়ে পড়ে। যার ফলে উৎকৃষ্ট কাব্যধারা সৃষ্টির পরিবর্তে কবিগান, খেউড়, তরজা, আখড়াই ও হাফ-আখড়াই প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে। যুগসন্ধিক্ষণের এ সময় দৈশিক পরিস্থিতির কারণে উৎকৃষ্ট কোন কাব্য রচনা করা সম্ভব হয়নি।

এ ক্রান্তিকালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথার্থ পরিচয় বিধৃত হয়ে যাছে আরবি-ফারসি শব্দ বহুল বাংলায় কাব্য রচনাকারী শায়েরদের সাধনায় ও কবিগানে। এ সময় সাহিত্যের যে ধারটির সবচেয়ে বেশি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, তা ছিল বিদেশি শব্দ বহুল বাংলা পুথি সাহিত্য। মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা পেলে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবি প্রাধান্য পায় এবং রাজভাষা হিসেবে গুরুত্ব পায় ফারসি ভাষা। যা ঐ সময়ের কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রমাণ রয়েছে-

'মানসিংহ পাতশায় হইল যে বানী,
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি
কিন্তু সে সব লোক বুঝিবারে ভারি।
না হবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।

[অন্নদামঙ্গল]

অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিরা 'যাবনী মিশাল' ভাষায় তথা আরবি, ফারসি ও উর্দু ইত্যাদি ভাষার শব্দ ব্যবহারে উন্নত মানের কাব্য রচনা করতেন।

ভিন্নধারার এসব সাহিত্য আঙ্গিককে গত একশ বছরে নানা নামে অভিহিত করা হলেও কোনটাই যথার্থতা পায়নি । "১৮৫৫ সালে রেভারেন্ড জে লঙ্গের পুস্তক তালিকায় এই

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাকে 'মুসলমানী ভাষা' ও এই ভাষায় রচিত কাব্যকে 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছেন।"[৩]

১৭৭৮ সালে হ্যালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন যে-

"যারা বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আরবি, ফারসি বিশেষ মিশ্রিত করে কথা বলতেন, তাঁরাই সবচেয়ে সুচারুরূপে বাংলা বলতেন।"[৪]

আরবি ফারসি শব্দ বহুল ভাষা তখন সাধারণ লোকের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কাব্যগুলোর বিষয়বস্তু ও ভাষারীতি বিবেচনা করে অনেকে একে 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য'[৫] বলে নামাঙ্কিত করেছেন। পরবর্তীতে ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুকুমার সেন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই রীতির কাব্যকে মুসলমানী বা ইসলামী বাংলা সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ড. এনামুল হক দোভাষী সাহিত্য সম্পর্ক বলেন-

> "ইংরেজ আমলের গোড়া হইতে রাজনৈতিক কারণে মুসলমানরা বিমাতাসুলভ ব্যবহার পাইতে থাকে এবং হিন্দুরা ইংরেজদের হাতে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে নিম্নবঙ্গের সাধারণ মুসলমানেরা তাঁহাদের বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রতিবাদ স্বরূপ ফারসি ও উর্দু ভারাক্রান্ত করিয়া এক স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করিতে থাকেন।"[৬]

ড. আনিসুজ্জামান এই রীতির কাব্য সম্পর্কে বলেছেন-

> "কলকাতার শস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে এই ধারার কাব্য দেশময় প্রচারিত হয়েছিল বলে বটতলার পুঁথি নামে একে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চলছে। সেটাকে সুভাষিত করতে যেয়েই বোধ হয় পুঁথি কথাটির উদ্ভব হয়। পুথি সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য বলে একে যথার্থভাবে চিহ্নিত করা

Dhaka University Institutional Repository

চলে না। কেননা আধুনিককালে বই বলতে আমরা যা বুঝি আগে পুঁথি বা পুথি বলতে তাই বোঝাতো।"[৭]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : দোভাষী রীতিকে 'মুসলমানী বাংলা'[৮] বলেছেন। এই মন্তব্য অর্থবহ এই কারণে যে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মুসলমান কবিগণ ইচ্ছে করেই তাদের রচিত কাব্যে ব্যাপকভাবে আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ড. আহমদ শরীফ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐকমত পোষণ না করে বলেছেন-

"আরবি শব্দ ফারসির মাধ্যমে এসেছে আর ফারসি ও তুর্কী শব্দ মিলে হয়েছে উর্দূ ভাষা, যার প্রভাব আছে হিন্দি ভাষায়। এই হিন্দুস্থানি তথা উর্দুর সঙ্গে বাংলার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠেছে আমাদের দোভাষী রীতি। অতএব দোভাষী রীতিই এর যোগ্য ও যথার্থ অভিধা।"[৯]

ভাষাবিচারে, এ ধারার কাব্যকে 'মিশ্র ভাষারীতির কাব্য' বলা হলেও এতে শুধু বাংলার সাথে অন্য একটি ভাষার মিশ্রণ ঘটেনি; এর সাথে শায়েরগণ নির্বিচারে আরবি, ফারসি, হিন্দি, উর্দু ও তুর্কি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফলে তা আর দোভাষী হয়ে থাকেনি।[১০]

ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ফারসি শব্দের মিলন সৌকর্যে গড়ে ওঠেছে আধুনিক উর্দু ভাষা এবং উর্দুর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে হিন্দি ভাষা। ফারসির নির্যাস লিপ্ত উর্দু ও হিন্দি একসূত্রে হিন্দুস্থানি নামে ভারতে মুসলিম আমলে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' রূপে প্রচলিত ছিল। বৃহত্তর অর্থে বাংলার সাথে হিন্দুস্থানি ভাষার মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে দোভাষী পুঁথি সাহিত্য।[১১] যারা আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দুর সঙ্গে বাংলার সংমিশ্রণজাত এই সাহিত্যকে মিশ্ররীতির কাব্য বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন, উপযুর্ক্ত যুক্তিসূত্রে তাঁদের অভিমত খন্ডন করে একে দোভাষী সাহিত্য রূপে চিহ্নিত করাই তাই সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং এ ধারার সাহিত্যকে দোভাষী বলাই সঙ্গত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতিঃ

দোভাষী পুঁথিগুলো মূলত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। কাব্যে একঘেয়েমি পরিহার করার জন্য কাব্যের মাঝে যমক, তোটক, ও চৌপদী ব্যবহার করেছেন। ফারসি ও উর্দু পুঁথির মত এ গুলোতে হাম্‌দ বা আল্লাহর গুণগান এবং পরে নাত বা হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর গুণগ্যান বা প্রশংসা দিয়ে শুরু করা হতো। পংক্তিগুলো বাংলা নিয়মে বাম থেকে ডান দিকে লেখা হতো এবং পৃষ্ঠাগুলো লেখা হতো ডান থেকে বামে দিকে। ১৮৩৯ সাল থেকে বাংলার শাসনকার্যে ফারসির স্থান নিল বাংলা। ফলে ধীরে ধীরে আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি বন্ধ হতে থাকে। আধুনিক যুগধারা প্রবর্তিত হলেও ফারসি-উর্দু জানা মুসলমান লেখকেরা পুরোনো কাব্যধারা ধরেই চলতে লাগলেন। এই ভাষার প্রকৃতি বিচারে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। [১২]

১. আরবি ফারসি হিন্দি শব্দের বাহুল্যপূর্ণ ব্যবহার যেমন-

'কেচ্ছার পহেলা আধা-শুনিয়া আলাম।
আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গাম ॥'

এখানে এগারটি শব্দের মধ্যে 'আধা শুনিয়া তরে করে' এ চারটি হল বাংলা শব্দ। তার মধ্যে একটি (আধা) উর্দু হিন্দিতেও চলে। আবার,

'ভেজ আয় রব মেরে দরুদে ছালাম
পিয়ারে নবি পর আপনে সুদাম ॥'

আলোচ্য পংক্তিটিতে একটিও বাংলা শব্দ নেই।

২. আরবি ফারসি শব্দের নামধাতু রূপে ব্যবহার যেমন-

'গোজারিয়া (গুজর) গেল রাত হইল ফজর
চলেন বাহার পরে খোশালিত(খুশহাল) মন ॥'

Dhaka University Institutional Repository

৩. হিন্দি ধাতুর ব্যবহার-

'এয়ছা ভাতে কতদূর নেকালিয়া (< নিকাল) যায়।'

৪. ফারসি বহুবচনের 'আন' বিভক্তির ব্যবহার: যেমন-

'বাহুড়িয়া মোকামেতে আইল এজিদান।'

৫. উপসর্গ ও অনুসর্গ রূপে বাংলা ও আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের প্রয়োগ।

'তরে (রে বিভক্তির মত গৌণ ও মুখ্য কর্মে)

আবু সামার তরে (= আবু সামাকে) কোথা না দিত ছাড়িয়া।'

৬. পুংলিঙ্গে বাংলা স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দ প্রয়োগ-

প্রিয়া= প্রিয়: যেন প্রিয়া বিনে পোড়ে হুতাশনে প্রিয়া বিরহিনী বামা।

বালা= বালক: কহেন খোদায়তালা মহিমে পাঠাই বালা

নাজুক অবলা বালা হাবসি জওান।

গুরুত্ব বিচার:

১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের কাব্যাদর্শ বিচলিত হয়। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা পেলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটে এদেশীয় শিক্ষার্থীর। কিন্তু যথার্থ আধুনিকতা, পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাব ,মানবমুখিতা, সমাজ সচেতনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও আত্মভাব-তন্ময়তা প্রভৃতির স্পষ্ট আভাস মিলল ১৮৬০ এর কাছাকাছি সময়ে। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত এই একশ বছর উচ্চ শ্রেণীর ভাগ্য বিড়ম্বনার ফলে প্রতিভাবান কবিরা পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। মধ্যযুগ অপসৃত হবার আগেই এই দোভাষী রীতির প্রচলন ঘটেছিল। আধুনিক যুগের উন্মেষের পরও তার অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল। মূলত এই ক্রান্তিকালই হচ্ছে এই ধারার বিকাশ লাভের কাল। মুসলমান ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের কাছে দোভাষী পুঁথিগুলোর মুল্য ছিল অনেক। এ কারণে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও ড. এনামুল হক বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

> "পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের উর্দুপ্রীতির ফলে এই যুগে সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাদের বাঙ্গালা ভাষা উর্দ্দু মিশ্রিত হইয়া, ইহার স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া ফেলিতে এবং ধীরে ধীরে, না উর্দ্দু-না-বাঙ্গালা এমন একটি শক্তিহীন ও দুর্বল জগাখিচুরী ভাষায় পরিণত হইতে বাধ্য হয়"।[১৩]

পুঁথিগুলোর সাহিত্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর হলেও একটি যুগের মানুষের রসাস্বাদনে যে ভূমিকা পালন করেছিল তা কোনভাবে গৌণ ভাবা যাবে না। শিল্পগত দিক থেকে দোভাষী পুঁথি সাহিত্য যতই ত্রুটিপূর্ণ হোকনা কেন, মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রেখে সাধারণ মুসলমানদের আনন্দ দিতে এর জুড়ি ছিলনা। ড.আহমদ শরীফ পুঁথি সাহিত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন-

> ''আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্য আমাদের, নগর-বন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের, তথা জীবন চর্যার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ...সাহিত্য রচনার, শেষ লক্ষ্য যদি সমাজকল্যাণ হয় তাহলে মানতেই হবে, দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানের জগত ও জীবন ভাবনার নিয়ামক। এই দিক দিয়ে এই সাহিত্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিমেয়।"[১৪]

দীর্ঘকাল দোভাষী পুঁথি জনসাধারণকে তৃপ্তি দান করেছে এবং জনগণের সমর্থন নিয়ে এগিয়ে গেছে। বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিতে তারা সম্পূর্ণ ভাবে দেশীয় মনোভাবকে বহন করেছেন। এদের শক্তির উৎস ছিল জনসাধারণের আনন্দ লাভের আগ্রহ। শিল্প নিপুণতার দিক থেকে বিচার করলে দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের মূল্য যতই তুচ্ছ হোকনা কেন, প্রাচীন কাব্যের ক্রমবিলীয়মান রশ্মির অস্পষ্ট আভা এ সমস্ত রচনায় ধরা পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীবিভাগঃ

বিষয়বস্তুর দিক থেকে দোভাষী পুঁথি সাহিত্যকে নিম্নলিখিত ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়।[১৫]

(১) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানঃ মধুমালতী, ইউসুফ-জোলেখা ।

(২) জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য শ্রেণীর পুঁথিঃ আমীর হামজা, সোনাভান, হাতেম তাই ।

(৩) নবী আউলিয়ার জীবনী কাব্যঃ কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আউলিয়া।

(৪) লৌকিক পীর পাঁচালীঃ সত্যপীর, গাজী কালু ও চম্পাবতী, লালমোনের কেচ্ছা।

(৫) ইসলামের ইতিহাস ধর্ম, রীতি, নীতি বিষয়ক কাব্যঃ নসিহত নামা, ফজিলাত দরুদ।

(৬) সমকালের ঘটনাশ্রিত কাব্যঃ সমকালের হাজী শরীয়তউল্লাহর মতো চরিত্র এবং ওয়াহাবি ফারায়েজির মতো ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত কাব্য।

তথ্য নির্দেশঃ

১. ড. মুহম্মদ এনামুল হক-*মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা , ৩য় সং, ১৯৬৮, পৃ. ২৭৪

২. ড. গোলাম সাকলায়েন-*ফকির গরীবুল্লাহ*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, কার্তিক-পৌষ) পৃ. ২ ১

৩. J.Long-*A descriptive catalogue of Bengali works*, calcutta, 1855 , P. 71.

Dhaka University Institutional Repository

৪. Sushil Kumar De-*A History of Bengali Literature in the ninteenth century, (1800-1825)* calcutta, 1919,P- 2

৫. সুকুমার সেন-*ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, বর্ধমান, ১৩৫৮,

৬. ড. এনামুল হক-*এনামুল হক রচনাবলী*, ৩য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. আনিসুজ্জামান-*মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্যাপিরাস সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৫ পৃ. ৯৫

৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-*বাংলা সাহিত্যের কথা*,- ২য় খন্ড, ঢাকা, ১৩৭১, ২৯৩ পৃ.

৯. ড. আহমদ শরীফ-*বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*,- ২য় খন্ড, ১ম সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৮৭৫, ৮৭৬

১০. আনিসুজ্জামান-পূর্বোক্ত, পৃ.- ৯৫

১১. আহমদ শরীফ-পূর্বোক্ত পৃ.- ৮৭৬

১২. সুকুমার সেন-*ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত পৃ. ১৮৬-১৮৭

১৩. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও ড. এনামুল হক-*আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯১৫, পৃ. ৮৯

১৪. ড. আহমদ শরীফ-পূর্বোক্ত, পৃ; ৮৮৪

১৫. ড. ওয়াকিল আহমদ-*বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, এপ্রিল, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রণয়োপাখ্যান ধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

'পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় মধ্যযুগে বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক।' [১] ধর্মের আবহে এ সময় নানা রকম পদ্য আখ্যায়িকা রচিত হতে থাকে অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলী , মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ- মহাভারত, ভাগবত, নাথ সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য। 'সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য-অঙ্গনে রোমান্টিক কাহিনী কাব্যগুলো একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।'[২] এসব কাব্যে প্রথম ধর্মভাবের পরিবর্তে মানবরস উন্মোচিত হয়। ধর্মমাহাত্ম্য ও দেবদেবীর গুণকীর্তনই ছিল মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মানবীয় বিষয় এসব কাব্যে অঙ্কিত হলেও মানব হৃদয়ের প্রাণিত স্পন্দনকে অনুভব করা হয়নি। রাধা ও কৃষ্ণের রূপকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার উপস্থাপনে রচিত হত বৈষ্ণব পদাবলী। অন্যান্য কাব্যগুলোতে ছিল অলৌকিক শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার। ধর্মীয় প্রভাবের বাইরে নতুন বিষয় ভাবনা সেকালে কেউ অনুমান করতে পারেনি বা প্রবর্তন করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ধর্মচর্চাই ছিল সাহিত্য চর্চার অনুরূপ।'মুসলমানেরাই যে এদেশে মানবিক রসাশ্রিত সাহিত্য ধারার প্রবর্তন করেন, এ তথ্য এখন আর কারুর কাছেই নতুন নয়।[৩] ১২০৪ খ্রী. বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে মুসলিম শক্তির বিস্তার ঘটতে থাকে। তুর্কি আমলের (১২০১-১৩৫০) দেড়শ বছরের রাজনৈতিক শাসন কাঠামোয় বঙ্গে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হতে।[৪] তুর্কিরা বাংলায় রাজ্যবিস্তারের সাথে সাথে ইসলামী আচার আচরণে জনসাধারণকে অভ্যস্থ করে তুলেছিল। অথচ বহুপূর্বেই (সপ্তম শতাব্দীতে) মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার সূত্রে এদেশে আগমন করেছিল। ফলে, ভিন্ন ধর্মের আখ্যায়িকার পরিবর্তে তাঁরা নতুন ভাবধারার কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করেন। ইসলামী ভাবধারাকে আরো বেগবান করতে মুসলমান শাসক ও প্রচারকরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির রূপকে প্রণয়োপখ্যান ধারার মতো মানবীয় কাহিনী সৃষ্টি করেন। এটি হচ্ছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ফল।[৫] এভাবে নতুন বিষয়, ভাব ও রসের দিক থেকে প্রণয়োপাখ্যান স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য রূপে এগিয়ে চলতে থাকল। 'বস্তুত ধর্মকথা নয়, বাস্তব-অবাস্তব, লৌকিক অলৌকিক, সত্য- কল্পনা মিশ্রিত প্রেমময়

Dhaka University Institutional Repository

মানবজীবন- কাব্যই সে যুগের রোমান্টিক কাব্য।[৬] এসব কাব্যে ধর্মভাব নেই। গভীরে ছিল গভীর মানবরসে সিক্ত। কাব্যের রচয়িতারা মূল গ্রন্থ অনুসরণে কাব্য নির্মাণ করতে গিয়ে ধর্মভাবকে মূল কাহিনীতে গ্রথিত করেছেন। সামন্ত প্রভূদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত প্রণয়োপাখ্যানে ধর্মভাবের উপস্থিতি উপেক্ষিত। 'এগুলো একান্তভাবেই মানব প্রেম ঘনিষ্ঠ কাব্য শিল্প'[৭] হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

রোমান্টিক কাব্যের আখ্যানভাগ সমসাময়িক জীবন থেকে নেয়া হয়নি। এগুলো ছিল মূলত অনুবাদ সাহিত্য। প্রণয়োপাখ্যানগুলোর কাহিনী উৎস ছিল আরব ইরানের মুসলিম ঐতিহ্য ও ভারতীয় কিংবদন্তি। ভারতীয় কাহিনীগুলো রচিত হয়েছিল হিন্দী অবধি ভাষায় আর আরব-ইরানের কাব্যগুলো সৃষ্টি হয়েছিল আরবি-ফারসি ভাষায়। অনুবাদ মৌলিক রচনা না হলেও অনুবাদ কর্মের দ্বারা এক ভাষার শিল্পসম্পদ অন্য ভাষায় প্রসূত হয়। হিন্দুদের সম্প্রদায়- রক্ষা ও সংস্কারের চেতনা রক্ষার মতো মুসলমান কবিরা নিজস্ব সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও বিকাশের অনুপ্রেরণায় এসব কাব্য অনুবাদ করেন। অনূদিত কাব্য হলেও এসব কাব্যে নিহিত থাকত ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচার-আচরণসহ নানাবিধ বিষয়।

প্রণয়োপাখ্যান কাব্যে সুফীতত্ত্বের উপস্থিতি ছিল প্রবল। তুর্কী বিজয়েরও পূর্বে এদেশে সুফী পীর দরবেশের আগমন ঘটেছিল। 'তারা কেবল ধর্মগুরু ছিলেন না, শিক্ষা গুরুও ছিলেন'[৮] 'উচ্চ ভাব, ভাষা ও কলারীতির প্রভাব' অচিরেই মুসলিম জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্বকে তারা এসব কাব্যে রূপকের আড়ালে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। ১৪৮০ খ্রী: শাহ ফিরোজ তুঘলকের আমলে লোকগাথাকে ভিত্তি করে 'চান্দাইন' রচনা করেন কবি মোল্লা দাউদ। এটি সুফী কবির তত্ত্ব রসাত্মক মরমী গাথা।

'ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারত বর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ আরো প্রসার লাভ করে। মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা ও উত্তর ভারত থেকে অসংখ্য মুসলমান ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে এসেছিলেন, কেউ বা ভাগ্যান্বেষণ করতে, কেউ বা ধর্মপ্রচার করতে, কেউ বা বাণিজ্য করার জন্যই'[৯]। এ সময় 'বঙ্গে তুর্কী শাসন কায়েমের পর থেকে শতাধিক বৎসর পর্যন্ত এদেশে খিলজী, তুঘলক, বলবনী শাসক গোষ্ঠীর উত্থান-পতন চলে।'[১০] আর সেই সূত্রেই এসময় এদেশে ব্যাপকভাবে সুফী দরবেশের আগমন ঘটতে থাকে।

ফারসি সাহিত্যের নিবিড় সান্নিধ্যে থাকা মুসলিম কবিরা এই সাহিত্যে নিরন্তর প্রবাহিত রোমান্সরসের অপূর্ব সৌন্দর্য ও জীবন-লীলার স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যকে অন্তরঙ্গ মমতায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সে কারণে তাদের রচিত সাহিত্যে ফুটে উঠেছে প্রণয়জীবনের আকুতি ও মিলন- বিরহের মধ্যে মানবীয় জীবন মহিমার স্বভাব সুন্দর গতি স্পন্দন।

রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলোর বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে মানবীয় প্রণয়কাহিনী। রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কাব্যে ঐশ্বর্যবান, প্রেমশীল, সৌন্দর্যপূজারী, জীবনপিপাসু মানুষের ছবি এঁকেছেন। দেবদেবীর পরিবর্তে ইসলামী আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব কাব্যে নতুন ভাব, বিষয় ও রসের যোগান দেয়া হয়েছিল। সাহিত্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যধারার বাইরে নতুন চেতনা ও রস মাধুর্যের পরিচয় ও ধারার কাব্যে ছিল স্পষ্ট। ধর্মাশ্রিত সাহিত্য ধারার বাইরে রচিত জীবন রসাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যানগুলো নতুন ঐতিহ্যের যাত্রা ঘোষণা করেছিল। ড. সুকুমার সেনের মতে 'রোমান্টিক কাহিনী কাব্যে পুরোনো মুসলমান কবিদের সর্বদাই একচ্ছত্রতা ছিল। রোমান্টিক কথা ও কাহিনীর অসাধারণ ক্ষেত্র আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় এ ধারার সৃষ্টি। এতে জীবনের বাস্তব পরিবেশের চেয়ে ইরানের যুদ্ধামোদী রাজদরবার ও নাগরিক সমাজের মানসচেতনার প্রতিফলন ঘটে। ড. ওয়াকিল আহমদের মতে, ' মানুষের প্রেমকথা নিয়েই প্রণয়কাব্যের ধারা, কবিগণ মধুকরী বৃত্তি নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বসাহিত্য থেকে সুধারস সংগ্রহ করে প্রেম কাব্যের মৌচাক সাজিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব ও অনাস্বাদিতপূর্ব। মুসলমান কবিরাই এ কৃতিত্বের অধিকারী'। দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' [১৩] মুসলিম সংস্কৃতির পত্তন ও বিকাশে মুসলিম কবিগণ আরবি-ফারসি-হিন্দি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, মুসলিম সমাজকে নতুন ভাবধারা ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। ড. সুকুমার সেন বলেন- " মধ্য যুগের বাঙালা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের উৎস গৌড় এবং তত্রত্য রাজদরবারে খুঁজিতে হইবে।" সামন্ত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণয়কাব্য দ্রুত দেশময় বিস্তৃতি লাভ করল। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করিলে বনফুলের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়িত। " প্রণয়কাব্যগুলোতে উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে রূপসৌন্দর্য, মানবপ্রেম, যুদ্ধ ও অভিযাত্রা, অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।

চৌদ্দ বা পনের শতকে কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে এ ধারার সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে অসংখ্য কবির হাতে এই কাব্যের বিকাশ ঘটে এবং আঠার শতক পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার মুসলমান কবিগণের স্বতন্ত্র অবদান ব্যাপকতা ও ঔজ্জ্বল্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যকে আরবি-ফারসি, হিন্দি সাহিত্যের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে যে নতুন ঐতিহ্যের প্রবর্তন ঘটেছে, তা অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়। পরবর্তীতে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দোভাষী পুঁথির মধ্যে এ ধারার বিষয়বস্তু স্থান পেলেও তা সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার্য হয়নি।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত ভাষা। মুসলিম শাসন কায়েমের সাথে সাথে পূর্বতন সাহিত্যিক ভাষার সাথে যুক্ত হতে থাকল ফারসি ও আরবি ভাষার প্রভাব। ফারসি প্রাধান্য পেল রাজভাষার আর আরবি স্থান পেল ধর্মীয় ভাষার। শাসন-ক্ষমতা দৃঢ় করতে এদেশীয় জনগণের ভাষা বাংলাকে তারা কদর দিতে শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

'আট-নয় শতকের সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পনের শতকে দুটি স্রোত ধারায় উজ্জীবিত হয়েছে।"[১৫] এর একটি হল বিষয় ও চিন্তা, অন্যটি হল রূপ ও ভাষা।

"বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতে গিয়ে কাহিনী কাব্যের প্রতিই সর্বাগ্রে মুসলমানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বলিয়া মনে রাখিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। ... তখনও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হয় নাই। সাহিত্য যে ধর্ম না হইয়া রস প্রধান হইতে পারে এই কথা তখনও বাংলা হিন্দু সাহিত্যিকগণ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।"[১৬]

'প্রেমই জীবনের মূলধন, জীবনের ভিত্তি ও অবলম্বন। তাই প্রণয়োপাখ্যান মাত্রেই প্রেমিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বেদনা বিধুর কাহিনী।"[১৭] প্রণয় কাব্যের প্রেম হল রূপক প্রেম। নায়ক-নায়িকার দেহ কেন্দ্রিক রূপ বর্ণনা প্রতি কাব্যে আছে। এসব কাব্যের প্রেম মিলনাত্মক। এই প্রেম-কথায় কল্পনার মিশ্রণ ব্যাপক। কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে তারা প্রাকৃত জগৎ থেকে অপ্রাকৃত জগতে বিচরণ করেছেন। এ কারণে এসব কাব্যে অলৌকিক উপাদানের ব্যবহার ঘটেছে ব্যাপকভাবে, সব প্রণয়কাব্যগুলোতে নায়ক- নায়িকার জন্ম রহস্য ও বাল্য শিক্ষার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বরাগ সঞ্চার ও রূপে উন্মাদনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন, চিত্র দর্শন, স্বপ্নদর্শন, কিংবা রূপ বর্ণনা শ্রবণ প্রসঙ্গ রয়েছে। নারী রূপের বর্ণনা প্রায় সব প্রণয়কাব্যে রয়েছে। নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় আলাওল প্রণয়োপাখ্যান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবস্থানে। ভাব গভীরতা ও দীর্ঘ বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় তিনি কাব্যের এক স্থানে অনবরত প্রায় সোয়া তিনশ চরণে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করেছেন। নায়িকার রূপ বর্ণনায় স্বতন্ত্র নারীর অস্তিত্ব অনুমিত হলেও তারা অভিন্নই রয়ে গেছে। বাস্তবতার পরিবর্তে কল্পনার/ তত্ত্বের বেড়াজাল অনুসরণ করার মানসে এমনটি ঘটেছে বলে মনে হয়। মধুমালতীর রূপ বর্ণনায় নিম্নোক্ত চরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

খগপতি চঞ্চু জিনি ভাল যে প্রখন্ড।
চিকন চিকুর চাচর জিনি ঘন খন্ড
ত্রিভঙ্গ মোহন রূপ কুসুম্বে জড়িয়া
হাররত্নে পয়োধরে রহিছে দুলিয়া
.....
সুবলিত দুই বাহু হেমলতা চারণ্ড
হেম রাম কোদালিয়া দুই পাত্র উরণ্ড।
-মধুমালতী, মুহম্মদ কবির

তাছাড়া সব প্রণয়োপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড। যেমন- দুর্গম ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় সমর্পণ, স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ, সুখত্যাগ, দুঃখবরণ ও বিপদবরণ। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যাদুমন্ত্র ও ক্ষমতাশীল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে লড়াই এবং স্বীয় ক্ষমতা, বুদ্ধি ও সাহসযোগে বিপদ অতিক্রমণ। পরিশেষে প্রেমিকার সাথে পূর্ণমিলন। নায়কের এসব দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় সহযোগী হিসেবে সহায়তা করে বাল্যবন্ধু, বাল্যসখী, পোষা পাখি, পরী ও দেবতা। গোপনমিলন ও স্বপ্ন-মিলনের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ পূর্ব মিলন বা পরকীয়া প্রেমের উপস্থিতি ঘটে থাকে। প্রণয়কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়-

"মধ্যযুগের বাংলা রোমান্টিক কাব্য সুচারু শিল্পকলা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও নির্মল আনন্দরসের অতুলনীয় মানস সম্পদ।--- কাব্যগুলিতে সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ-মিলনপূর্ণ মানব জীবনের অন্তর্লোক স্পন্দিত ও গুঞ্জরিত হয়েছে। ..... মানব– চেতনার মর্মস্পন্দন, মুক্তিবিলাস, স্বচ্ছন্দ গতি ও মর্মলীলা আছে বলেই এগুলি মানব কাব্য নয়, রোমান্টিক কাব্য।" প্রণয়োপাখ্যানের রচনা–রীতি মঙ্গল কাব্যের অনুরূপ। 'উভয়েই আখ্যানধর্মী বর্ণনামূলক কাহিনী কাব্য। পুরো কাহিনী পয়ার, ত্রিপদী ছন্দে রচিত হত।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা হিন্দি কাব্যের দোহা (সাধন) 'চৌপাই' ভেঙে বাংলা পয়ারে রূপান্তরিত করেন। খুব সম্ভব, ফারসি খমুস্যাহ্ বা পঞ্চকাব্য বাংলা রোমান্স কাব্যের আদর্শ ছিল।'

অনুবাদকালে কবিগণ কাব্যগুলোর যথার্থ নাম দিতে সক্ষম হননি। এগুলো সাধারণভাবে 'মসনভি'নামে পরিচিত ছিল। এই ফারসি মসনভি রোমান্টিক কাব্যের আদর্শ ছিল।

প্রণয়কাব্যে গানের প্রভাব আছে। 'কাহিনীর মাঝে মাঝে গান আছে; গানের সাথে সুর ও তালের উল্লেখ আছে। গান ছাড়াও কোন কোন ঘটনার শুরুতে রাগের উল্লেখ আছে।'

'মঙ্গলবাক্যের আঙ্গিক ও ছন্দের সাথে প্রণয়োপাখ্যানের নিকট সাদৃশ্য আছে। মঙ্গলকাব্য, ধর্মের পাঁচালি, আর প্রণয়োপাখ্যান রসের পাঁচালি দ্বিপদী ও ত্রিপদী পয়ার ছন্দে রচিত। 'পাঁচালি রীতি' প্রণয়োপাখ্যানের রচনারীতি।

মধ্যযুগের বিস্তৃত পর্বে অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে প্রণয়োপাখ্যান ধারা পরিপুষ্ট হতে থাকে। শাহ মুহম্মদ সগীর এর মাধ্যমে এ ধারার সূচনা ঘটে। আঠার শতক পর্যন্ত এর পদচারণা অক্ষুণ্ন থাকে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেমন এর বিস্তার ঘটেছিল, তেমনি বাংলার বাইরে রোসাঙ্গ বা আরাকান রাজসভাতে এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও এ রীতির সার্থক চর্চা হয়েছিল। পাঠান শাসক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ 'তাঁর রাজত্ব কালে (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন'। মূলত পাঠান আমলে রোমান্স কাব্য সৃষ্টির প্রাণবন্ত ধারার পত্তন হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক কারণে তৎকালে বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকেরা রোমান্স কাব্য রচনায় প্রাগ্রসর হয়নি। ড. এনামুল হক পঠান আমলে সৃষ্টি কাহিনী কাব্য বা প্রণয়োপাখ্যানের যে তালিকা প্রদান করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।[১৮]

" (ক) মুসলিম কাহিনী কাব্য -

(অ) ইউসুফ-জলিখা–শাহ মোহম্মদ সগীর

(আ) হানিফা ও কয়রা-পরী–সাবিরিদ খান

(ই) সয়ফুল মূলক - দোনাগাজী

Dhaka University Institutional Repository

(ঈ) লাইলী মজনু- বাহরাম খান

(খ) ভারতীয় কাহিনী কাব্য-

(অ) মনোহর-মধুমালতী- মুহাম্মদ কবীর

(আ) বিদ্যাসুন্দর- সাবিরিদ খান

উপরের তালিকায় স্পষ্টতর যে, মুসলিম কবিরা প্রথমে আরবি-ইরানি কাহিনীর সাথে পরিচিত হন। পরবর্তীতে ভারতীয় ঐতিহ্যমূলক কাহিনী অবলম্বনে প্রণয়কাব্য রচনা করেছেন।

পাঠান আমলের পর প্রণয়কাব্যের সার্থক ও বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী সংঘটিত হয়েছিল মুঘল আমলের কালপর্বে। মুঘল আমলে রচিত নিম্নলিখিত প্রণয়োপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায় ড. এনামুল হক কৃত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে'—

১. মুহম্মদ খান (ক) সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ

(খ) হানিফার লড়াই

আব্দুল হাকিম (ক) লালমতি-সয়ফুল মূলক

(খ) ইউসুফ- জলিখা

নওয়াজিস খাঁ (ক) গুল-ই-বকাওয়ালী

মঙ্গল চাঁদ (ক) সাহজালাল-মধুমালা

ফকীর গরীবুল্লাহ (ক) ইউসুফ জলিখা

শেখ সাদি (ক) গদামল্লিকা

২. রোসাঙ্গ রাজসভার কবিগণ—

দৌলত কাজী (ক) লোর চন্দ্রানী

মরদন (ক) নসীরা নামা

কোরেশী মাগন ঠাকুর (ক) চন্দ্রাবতী

Dhaka University Institutional Repository

আলাওল (ক) পদ্মাবতী

(খ) কাজী দৌলতের সতীময়না কাব্যের উত্তরাংশ

(গ) সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল

৩. ত্রিপুরা রাজ্য -

সৈয়্যিদ মুহম্মদ আকবর - জেবলসুলক- শামারোখ

মুহম্মদ রফীউদ্দীন - জেবলমূলক- শামারোখ

মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক– সয়ফুল মূলক- লালবানু

মুঘল আমলেও স্বাধীন মুসলিম বাংলায় অধিক পরিমাণে প্রণয়কাব্য রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. এনামুল হক বলেন—

"প্রকৃত পক্ষে, এইগুলিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম ললিত-কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উন্নত ধরনের কাব্য কলার অপূর্ব শ্রীবিমণ্ডিত ফরাসি, প্রেমোপাখ্যান- মূলক কাব্যগুলির প্রত্যক্ষ সংশ্রবে আসার ফলে, বাংলা সাহিত্যের এই কাব্যগুলি নানা দিক হইতে পৃথক ও অধিকতর কাব্য সুষমাণ্ডিত। হিন্দু দিগের কোন বাংলা কাব্যই এগুলির সহিত তুলিত হইতে পারে না।" (পৃ: ২৬৪- ২৬৫; মুসলিম বাংলা সাহিত্য)।

বাংলার মুসলমান কবিরা মানব রসে সিক্ত রোমান্টিক কাব্য কয়েক শতক অবধি রচনা করেছেন। যার সূচনা হয়েছিল পনের শতকে, আর এর ব্যাপকতা স্তিমিত হয়ে এসেছিল আঠার শতকের শেষে। অবশ্য আঠার শতকের সূচনাকালে ও মধ্যভাগে দোভাষী শায়ের কতৃক রচিত পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে এ ধরনের বিষয়বস্তু আখ্যান হিসেবে গৃহীত হলেও তাতে কোন ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয়নি। রোমান্টিক কাব্যধারায় যে সব উলেণ্টখযোগ্য কবি তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল-

Dhaka University Institutional Repository

কাল	কবি	কাব্য
পনের শতক	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জোলেখা
ষোল শতক	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লী মজনু
”	মুহম্মদ কবীর	মধুমালতী
”	শাহ বারিদ খান	হানিফা কয়রাপরী বিদ্যাসুন্দর
”	দোনাগাজী চৌধুরী	সয়ফুল মূলুক বদিউজ্জামাল
সতের শতক	আলাওল	পদ্মাবতী, সপ্তপয়কর
”	কোরেশী মাগন ঠাকুর	চন্দ্রাবতী
”	আবদুল হাকিম	ইউসুফ জোলেখা
”	নওয়াজিস খান	গুলে বকাওলী
”	মঙ্গল চাঁদ	শাহজালাল মধুমালা
”	শেখ সেরবাজ চৌধুরী	ফক্কর নামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল
”	মুহাম্মদ আকবর	জেবলমূলুক শামারোখ
আঠার শতক	ফাকর গরীবুল্লাহ	ইউসুফ জোলেখা সোনাভান আমির হামজা (প্রথমাংশ)
”	সৈয়দ হামজা	মধুমালতী আমির হামজা (শেষাংশ)
”	মুহম্মদ রফিউদ্দীন	জেবলমুলুক শামারেখ
”	মুহম্মদ মুকীম	গুলে বকাউলী
”	মুহাম্মদ আলী	মল্লিকজাদা, হাসনাবানু
উনিশ শতক	মুহম্মদ চুহর	মধুমালতী ,দেলারাম
”	সৈয়দ মুহম্মদ নাসির	বেনজীর বদরই-মুনির

Dhaka University Institutional Repository

”	তমিজী	লালমতি- তাজলমূলুক
”	মালে মোহাম্মদ	সয়ফুল মূলুক বদিউজ্জামাল
”	বাকের আলী চৌধুরী	মনুচেহর মাসুমাপরী
”	মুহম্মদ খাতের	লাইলী মজনু, মৃগাবতী যামিনীভনে, গুল ও হরমুজ

শাহ মুহম্মদ সগীর

শাহ মুহম্মদ সগীর প্রণয় কাব্য ধারার আদি কবি। তিনি যে কাব্যরচনা করেন, তার নাম ‘য়ূসফ জলিখা’। অসাধারণ প্রতিভাবান কবি ছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। [২] কাব্যটি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) রাজত্ব কালে রচিত হয়। তবে রচনা কাল নিয়ে বিভিন্ন জনের মধ্যে মতভেদ আছে। সগীর মুসলিম সমাজের প্রচলিত ও জনপ্রিয় কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্যটি রচনা করেন। তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় না থাকায় শব্দ ব্যবহারের প্রকৃতি থেকে আমরা তাকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে মনে করতে পারি। কারণ চট্টগ্রামের কতিপয় আঞ্চলিক শব্দ কনে, তরুঞ্জা, কাচিয়া (ফুল)= কাশ, শব্দ তার কাব্যে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া তার প্রায় সকল পুঁথিই চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা হতে পাওয়া গেছে। সে সময় কবিরা কোন না কোন পীর বা দরবেশের অধীনে থাকতেন, সে কারণে তিনি কাব্যের ভণিতায় “শাহ” বলে পরিচয় দিয়েছেন। যেমন-

‘কহে শাহা মোহাম্মদ ইছুপ জলিখা পদ
দেশি ভাষা পয়ার রচিত।’

‘ইউসুফ জোলেখার কাহিনী উৎস কোরান’। পবিত্র কোরআনের ‘সুরা ইউসুফ’ অধ্যায়ের ২২ রুকুর মোট ১১১টি আয়াতে কাহিনীটি বিবৃত হয়েছে। উৎস বর্ণনা কাব্যে উল্লে আছে। যেমন- ‘পুরান কোরান মধ্যে দেখিনু বিশেষ।’

Dhaka University Institutional Repository

ইছুপ জলিখা বাণী অমৃত অশেষ।' তাছাড়া ওল্ড টেস্টামেন্টে অনুরূপ কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়।[৭] কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। রাজবন্দনা থেকে অনুমান করা যায় তিনি কোন শতকের কবি ছিলেন—

"মানুষ্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার।"[৮]

রাজ বন্দ নায় তিনি গ্যেছ বাদশাহের বন্দনা করেছেন এবং বাদশাহ স্বীয় কৃতিত্ব বলে পিতার কাছ থেকে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছেন। 'সমগ্র বাংলার ইতিহাসে একমাত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সহিত তাঁহার পিতা সিকান্দর শাহের যুদ্ধের কথা জানিতে পারা যায়। সুতরাং কবির উদ্দিষ্ট বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০) ব্যতীত কেহ নহেন।' 'তবে গ্যেছ শব্দটি নিয়ে মতদ্বৈত আছে।' [৯] লিপির জন্য শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় 'য়েহ্ন' পাঠের পক্ষপাতি[১০] "গিয়াসউদ্দীন নামে শুর বংশের তিনজন সুলতান ১৫৫৫ থেকে ১৫৬৪ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।"[১১] এরা কেউ 'বিদ্যোৎসাহী' ছিলেন না ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এদের কাউকে কবির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিহ্নিত করেননি। [১২] তাছাড়া রাজ প্রশস্তির বর্ণনায় পাওয়া যায়—

"পুত্র শিষ্য হন্তে তিই মাগে পরাজএ "
মহাজন কাব্য ইহ পুরণ করিআ
লইলেন্ত রাজ্যপাট বংগাল গৌড়ি আ।
.....
রমনী বল্লভ নির্প রসে অনুপমা
কণে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিলা।'

Dhaka University Institutional Repository

অনেক তথ্য সুনির্দিষ্ট কোনো শাসকের সময়কালকে চিহ্নিত করে না। আপ্ত বাক্য 'পুত্র শিষ্যে হস্তে তিই মাগে পরাজয়' কথাটির সাথে একমাত্র গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের সাথে তাঁর পিতা সিকান্দার শাহের যুদ্ধের কথা জানতে পারা যায়।

সব বাদশাহ-সামন্তরা ছিলেন নারী বিলাসী। তবু রমণী বল্লভ বলে 'গ্যেছ ' সুলতানের উল্লেখ তাঁর নামে সুপ্রচলিত তিন বেগম বৃত্তান্তেরই স্মারক। উল্লেখ , গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের সরব, গুল, লালা নামের তিনজন প্রিয় বেগম ছিলেন। তাঁরা বাদশাহের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর শব গোসল করানোর অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ড. এনামুল হকের মতে " য়ুসুফ জোলেখা' কাব্যের ভাষা খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পদে (১৪৮০ খ্রী) রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' মধ্যবর্তী ভাষা। অপিচ 'য়ুসুফ জোলেখা'র ভাষা অনেক বিষয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' ভাষার মধ্যবর্তী হারানো সূত্রকে ধরাইয়া দেয়।" তাছাড়া তাঁর কাব্যে প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে।[১৩] যেমন- নৌআলি জৌবন (নব যৌবন),উয়ারি(দোলান্দপুরী)– খাঁখার (কলঙ্ক), জিউ(জীবন), সাচা (সত্য) ইত্যাদি।

শব্দরূপ কারক বিভক্তি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ড. হক কাব্যখানির যে প্রাচীনতা দাবী করেছেন, তা সুনিশ্চিত ভাবে গ্রহণ করা যায় না।[১৪] অপরদিকে ড. এনামুল হক মনে করেন, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহর আমলেই ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচিত হয়। তার মতে, আল্লাহ অর্থে মুসলিম কবির কাব্যে 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহার। এটি চৌদ্দ পনের শতকেই সম্ভব । তাছাড়া আপ্তবাক্য নারী বিলাসী, নামের ভণিতা, সময় কালে ব্যবহৃত শব্দসহ অন্যান্য অনুমানে ড. এনামুল হক ইউসুফ জোলেখা কাব্যকে পনের শতকের গোড়ার দিকে,[১৬] রচিত বলে অনুমান করেন। সুলতান আহমদ ভূঁইয়া মনে করেন- "রাজ প্রশস্তি আসল কাব্যের চরিত্র তাইমুস রাজার স্তুতি - গৌড় বন্দনা কোন সুলতানের নয়।" কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে ড.সুখময় মুখোপাধ্যায়,শেখ রুহুল আমিন , সুলতান আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

ভূঁইয়া ও ড. আবদুল করিমের মতের লঘু-গুরু প্রভাব স্বীকার করে বলেন- সগীর যে খুব আধুনিক কবিও নন, তাও কাব্যের ভাষা থেকেই বোঝা যায়। মোটামুটি বিচার করে তিনি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে "ইউসুফ জোলেখা" রচনা করেছিলেন বলে মনে করা যায়।" [১৮] ড. হক তাদের মতকে স্বীকার না করে কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরকে তিনি পনের শতকের কবি বলে মনে করেন।

'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে অতি প্রাচীন প্রণয়-আখ্যানকে কাহিনী হিসেবে নেয়া হয়েছে। বাইবেল ও কুরআন শরীফে নৈতিক উপাখ্যান হিসেবে এই কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী (মৃত্যু-১০২৫খৃ:) এবং সুফী কবি জামী (মৃত্যু ১৪৯২) মূল কাহিনী অনুসারে 'ইউসুফ জোলেখা' নামে কাব্য রচনা করেন। ফেরদৌসীর কাব্য ছিল রোমান্স জাতীয় আর জামীর কাব্য ছিল রূপক শ্রেণীর। অনুবাদ ও বিষয়বস্তুর পরিবেশনায় সগীরের কাব্যের সাথে তাঁদের কাব্যের কোন মিল নেই। জামী সগীরের পরবর্তী কবি বলে তাঁর কাব্যের সাথে কোন মিল নেই। মহাকবি ফেরদৌসীর কাব্যের রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সগীরের কাব্যের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ড. এনামুল হক শাহ মুহম্মদ সগীরের "ইউসুফ জোলেখা" কাব্যের কাহিনীর উৎস সম্পর্কে বলেন- "কুরআন ও ফেরদৌসীর কাব্য ব্যতীত মুসলিম কিংবদন্তিতে ও স্বীয় প্রতিভায় নির্ভর করিয়াই শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁহার 'ইউসুফ জলিখা' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।" [১৯] অন্যদিকে, ড. ওয়াকিল আহমদ মনে করেন- 'মুহম্মদ সগীর কুরআনকে ভিত্তি করে ইসলামি শাস্ত্র, ইরানের আধ্যাত্মিক কাব্য ও ভারতের লোক কাহিনীর মিশ্রণে ইউসুফ জোলেখা কাব্যের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নির্মাণ করেন।' [২০] সগীরের কাব্যেও সুফী তত্ত্বের রূপক থাকতে পারে, তবে তাঁর কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য আছে।' [২১]

এই ইউসুফ জোলেখা ছাড়া আবদুর রহমান জামীর (১৪১১-৯) ইউসুফ জোলেখাই (১৪৮৩) মুসলিম জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের বিষয় হল ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনী। কাব্যের শুরুতে আল্লাহর ও রসুলের

Dhaka University Institutional Repository

মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজবন্দনা স্থান পেয়েছে। জোলেখার জন্ম বৃত্তান্ত দিয়ে মূল কাহিনী শুরু হয়েছে আর ইবনে আমীনের সস্ত্রীক মিশর প্রত্যাবর্তন দিয়ে এর সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে। মাঝের ৬৫টি বৃত্তান্ত দ্বারা কাহিনী বিবৃত হয়েছে।'[২২]

পশ্চিমের প্রভাবশালী তৈমুর বাদশাহের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা জোলেখা। পরিণত বয়সে মিশরের রাজা আজিজ মিসিরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। অন্যদিকে কেনান প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ইয়াকুব। তাঁর পুত্র ইউসুফ ছিলেন অসামান্য সুন্দরের প্রতীক। নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইউসুফ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের কারণে গৃহচ্যুত হন এবং দাসরূপে মিশরে প্রেরিত হন। যুবক ইউসুফের রূপে মুগ্ধ হয়ে জোলেখা তাকে ক্রয় করেন এবং নিজ গৃহে দাসরূপে রাখেন। জোলেখা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি গভীরভাবে প্রেমাসক্ত হন এবং অবৈধ প্রেম নিবেদন করেন। নানা প্রলোভন, ভয়, অত্যাচার ও উপেক্ষার মধ্য দিয়ে ইউসুফ নিজেকে সংবরণ করেন। নানাভাবে আকৃষ্ট করেও তিনি ইউসুফকে বশীভূত করতে পারেননি। তিনি সততা, ন্যায়, ও বুদ্ধিমত্তার গুণে পরবর্তীতে মিশরের মন্ত্রী ও অধিপতি হন। ঘটনাক্রমে জোলেখা তখনও তাঁর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে পারেননি। এরই মধ্যে ইউসুফের মনের পরিবর্তন ঘটে। ইউসুফের মহানুভবতায় বৃদ্ধা জোলেখা পূর্ব যৌবন ফিরে পান এবং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কাব্য প্রধান এই কাহিনীর সাথে আরও অসংখ্য উপকাহিনী স্থান পেয়েছে।

"এরই সাথে শেষ হলেও কাব্য কথা শেষ হয় উপকাহিনীর সংযোজনে। এর সাথে ইবন আমীন ও বিধু প্রভার উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে, মূল কাহিনীর সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। শাহ মোহাম্মদ সগীরের তা নিজস্ব সংযোজন।"[২৪]

কবি দেশী ভাষায় ধর্মীয় উপাখ্যান রচনা করতে চেয়েছিলেন। কবি স্বীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাব্যে লিখেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

রচন রতন মনি যতনে পুরিয়া

কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ
ইচ্ছুফ জোলেখা কথা অমিয়া অশেষ।
কহিব কিভাবে চাহি সুধারম পুরি
শুন্হ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি।।"

কবি প্রেমরসে সিক্ত করে ধর্মবাণী প্রচারে আগ্রহী হলেও তা কাব্যে প্রেমকাহিনী হিসেবেই রূপলাভ করেছে। ইরানি সুফী কবিদের মত ইউসুফ জোলেখার প্রেমকাহিনীতে যে রূপক অনুভব করেছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর তাকেই কাব্যের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত করেছিলেন। সুফীতত্ত্বের মাশুক-আশুক তত্ত্বের তথা জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন আকাঙ্ক্ষা ইউসুফ জোলেখার প্রণয়ের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীর মূলকাহিনী, কাঠামোতে ইবন আমীন এবং বিধূপ্রভার স্বতন্ত্র প্রণয়োপাখ্যানটি সার্থকতার সাথে সংশিণ্টষ্ট করেছেন।"[২৬] কাহিনী উৎস ফারসি হলেও কাব্য বর্ণনায় কবি দেশীয় উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রের প্রকৃতি ও প্রবণতায় নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শ প্রদান করেছেন। বাংলা কাহিনী কাব্যের মতো তাঁর কাব্যে বারমাস্যা বর্ণনা রয়েছে। কাহিনী বর্ণনা, চরিত্রায়ন, অলংকার ও ছন্দ প্রয়োগের কুশলতায় তাঁকে যথেষ্ট পারঙ্গম বলে মনে হয়। কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নেই বললেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যের রক্তমাংস ও বাংলার আবহ এর প্রাণ বলে কাব্যখানি পাঠ করতে মনেই হয় না যে, এ কোন বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ" [২৭] কাব্য বিচারে শাহ মুহম্মদ সগীরকে দক্ষ কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ প্রণয়কাব্যের আদি রচয়িতা হিসেবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবীদার। 'তাহার ভাষা প্রাচীন বটে, তবে কাঁচা হাতের লেখা নহে। ইহা রচনার পূর্বে তিনি অন্য লেখায় হাত পাকাইয়া থাকিবেন।"[২৮] সবদিক বিচারে সগীরের কাব্য যথেষ্ট কর্মকুশলতায় পরিপূর্ণ এবং প্রণয়োপাখ্যান ধারায় প্রথম কবি হিসেবে তাঁর কাব্য সাহিত্যিকমূল্য সমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

দৌলত উজীর বাহরাম খান

'লায়লী মজনু' কাব্য প্রণয়োপাখ্যান কাব্য ধারার অন্যতম সংযোজন। কবি পরিচয় ও কাব্য রচনাকাল নিয়ে কেউ একমত হতে পারেননি। অনুমান ও কাব্যে আত্মবিবরণীর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কবি সম্পর্কে বিস্তর জানা যায় না। কবি তাঁর কাব্যে যে আত্ম পরিচয় দিয়েছেন তা অনুসারে কবির পরিচয় ব্যক্ত করব। নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন-

পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হুসেন শাহাবর।
তায় রত্ন সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েতে শোভিত মনোহর।
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদখান

তানপুর ক্ষুদ্র সম নাম মোর বহরম
মহারাজ গৌরব অন্তরে ॥
পিতাহীন শিশুজানি দয়াধর্ম মনে আনি
বাপের খেতাব দিল মোরে।

কাব্যমতে কবির পূর্ব পুরুষ ছিলেন হামিদ খান। নিয়াম শাহের আমলে কবির পিতা মুবারক খানকে 'দৌলত উজীর' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'পিতার মৃত্যুর পর বাহরাম খান পেলেন সে উপাধি ও পদ'।[১] কবি বাহরাম খান ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিজাম শাহ সুর হইতে 'দৌলভ-উজীর' উপাধি লাভ করেছিলেন।[২] কবির পীর ছিলেন আসহাবউদ্দীন কবির পিতা সুলতান হোসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১১) এর প্রধান সচিব।[৩] তিনি চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুটো পরগনা লাভের পর।

Dhaka University Institutional Repository

কবির পূর্ব পুরুষ চট্টগ্রামের ফতেহাবাদেই[৩] (বর্তমানে হাটহাজারির একটি গ্রাম) বাস করত। কবির প্রথম রচনা 'কারবালা'। লায়লী মজনু তাঁর দ্বিতীয় কাব্য। ড. এনামুল হকের মতে, ১৫৬০ হইতে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দৌলত উজীর বাহরাম খান 'লায়লী মজনু' কাব্য রচনা করেছিলেন।[৪]

'লায়লী মজনু' কাব্যটি কবির শেষ বয়সের রচনা। কারো মতে ১৫৪৩ সনের মধ্যে লায়লী মজনু কাব্য রচিত হয়। কাব্যে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রশস্তি সূত্রে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ কবির আবির্ভাব কালটিকে শতাধিক বছর পিছিয়ে দিয়ে বলেন, কাব্যের রচনা কাল ১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দ।

'লায়লী মজনুর প্রণয় কথা একটি কল্পিত উপাখ্যান'। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কাহিনীর ঘটনাস্থল আরব হলেও আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে উপাখ্যানটি সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। এমনকি 'লায়লী মজনু' সম্পর্কে কোন কিংবদন্তিও চালু নেই আরবে। অথচ ঘটনাস্থল আরব ও পাত্রপাত্রিও আরবীয়। এমনকি ফরাসি কবি আবদুর রহমান জামীর কাব্যে লায়লীকে উমাইয়া বংশের খলিফা আবদুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫) উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মেয়ে হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আবার আমীর খসরু কাব্যে লায়লী মজনুকে বাদশাহ মারওয়ান ইবন হাকামের (৬৮৩-৮৪০) সমসাময়িক হিসেবে নির্দেশ করেছেন। এছাড়া তাদের দুজনের বংশ পরিচয়ও লিপিবদ্ধ আছে। 'লায়লী-মজনু' প্রণয় কাহিনীটি ইরানে উদ্ভূত এবং সুফী কবিদের লালনে পুষ্ট। ফরাসী কবি রূদকীর (মৃত্যু ৯৪০ খ্রী) খণ্ড কবিতাতে লায়লী-মজনু নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বাহরাম খানের আগে যেসব কবি লায়লী-মজনু কাব্য লেখেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফরাসি কবি নিজামী গঞ্জভী। তিনি ১১৮৮ খ্রী. লায়লী মজনু কাব্য রচনা করেন। এরপর দিলণ্টীর কবি আমীর খসরু ১২৯৮ খ্রী লায়লী-মজনু রচনা করেন। লায়লী-মজনু আখ্যানের পরবর্তী ফরাসি কবি আবদুর রহমান জামী। তার কাব্যের রচনা কাল ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ। লায়লী মজনু সুফী তত্ত্বাশ্রিত রূপক কাব্য। ড. এনামুল হকের মতে, লায়লী-মজনু ফারসি কবি

Dhaka University Institutional Repository

জামির ঐ নামীয় কাব্যের ভাবানুবাদ। স্থানে স্থানে মূল ঘেষে অনুবাদ যেমন আছে, স্বাধীন রচনায়ও তেমন দেখা যায়। [১১] লায়লী মজনু রাধা কৃষ্ণের প্রেমের মতো আধ্যাত্মপ্রেমের রূপকাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যান। "[১২]

আরবের এক ধনপতি আমীর। সবকিছু থাকলেও পুত্র লাভে কাতর। অনেক প্রার্থনায় পুত্র লাভ করলেন এবং যথাসময়ে তাকে পাঠশালায় পাঠানো হল। শিশুকাল থেকেই কএস ছিল নাচ, গান ও নারী প্রেমী। পাঠশালায় মালিক কন্যা সুন্দরী লায়লীর প্রেমে পড়ল এবং গোপনে মিলিত হয়। এভাবে ধীরে ধীরে প্রেম গভীরতর হয়। এক সময় তাদের প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে গেলে লায়লীর পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়া হয়। লায়লী বিরহে মজনু কাতর হয়ে পড়ে। ছদ্মবেশে সে দুবার লায়লীর সাথে দেখা করতে যায় এবং লায়লীর পিতা তাকে মেরে বের করে দেয়।

নায়ক কএস মজনু বা পাগল হয়ে নজদ বনে বসবাস শুরু করে। এদিকে লায়লীও বিরহে কাতর। তাকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এদিকে কএসের পিতা অনেক ভেবে লায়লীর সাথে তার ছেলের বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেন। লায়লীর পিতা তা প্রত্যাখ্যান করেন। মজনুর মানসিক সুস্থতার শর্তে লায়লীর বাবা কএসের সাথে বিয়ে দিতে সম্মত হন। নজদ বন থেকে কএসকে ফিরিয়ে এনে অপূর্ব সাজ বেশে লায়লীর পিতার কাছে হাজির করা হয়। এমন সময় লায়লীর কুকুর সেখানে এলে কএস তার পদচুম্বন করে। এতে লায়লীর বাবা রেগে বিয়ে বন্ধ করে দেন। আমীর লজ্জিত হয়ে পুত্রকে এক যোগীর নিকট নিয়ে যান। তবুও সে প্রেম দীক্ষাই প্রার্থনা করেন। কএসের বাবা মারা যায়। লায়লীর বিয়ের প্রস্তাব আসে। বিয়ে হলেও বাসর ঘরে সে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে। কএস নজদ বনে একাকী বাস করে। স্বপ্নে সে লায়লীর সাক্ষাৎ পায়। নয়ফলরাজ মজনুর সাক্ষাৎ পায় এবং লায়লীর সাথে মিলনের প্রস্তুতি নেয় এবং যুদ্ধ জয়লাভ করে লায়লীকে হস্তগত করে। নয়ফল লায়লী প্রেমে আকৃষ্ট হয়। মজনুকে হত্যা করতে গিয়ে সে নিজেই মারা যায়। মজনু আবার বনে চলে যায়। লায়লীর পিতা সপরিবারে শামদেশে

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রাকালে লায়লী নজদ বনে মজনুর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে বলেন। মজনু সমাজ বিরোধী কাজ করতে পারবে না বলে তাকে ফিরিয়ে দেয়। বিরহে লায়লী মারা যায়। লায়লীর মায়ের মাধ্যমে মজনু লায়লীর সংবাদ পেয়ে ঘ্রাণশক্তিতে লায়লীর কবর চিনে নেয়। কবরে বিলাপ করতে করতে কএস মারা যায়।

কাব্যের কাহিনীতে আকর্ষণ না থাকলেও কাহিনীটি চমৎকার। 'তবে কাব্যটি মানবিক আবেদন এবং উচ্চ কবিত্ব শক্তির প্রকাশক হিসেবে উজ্জ্বল।'[১৩]

রূপক কাব্য হলেও লায়লী মজনু কাব্যটি শেষ পর্যন্ত লৌকিক প্রণয় কাব্যে পরিণত হয়েছে। জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপকে নর-নারীর প্রেম রচিত হলেও বাংলা কাব্যে তা মানবিক প্রেমের আখ্যানে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের মতোএ কাব্যেও অলৌকিকতার উপস্থিতি অনেকটা কম। মধ্যযুগের কাব্য বিবেচনায় লায়লী মজনু কাব্যটিতে 'অশ্লীলতার কোন উপস্থিতি নেই।' শুদ্ধতাও সূক্ষ্ম রুচিবোধের প্রকাশটিও বিস্ময়কর।

কাব্যটিতে অলংকারপূর্ণ ও মার্জিত ভাষা, শব্দালংকার ও অর্থালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ, সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গি ও শিক্ষা চেতনা বাহরাম খানকে স্বতন্ত্র অবস্থানে নিয়ে গেছে। 'লায়লী মজনু উচ্ছ্বাসপ্রধান কাব্য, হৃদয়াবেগেই এর প্রাণ। সেজন্য এ কাব্যে চরিত্র গড়ে ওঠেনি। পুরুষের তথা নায়কের বারমাসী এ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'[১৪] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'লায়লী-মজনু আদি রসাত্মক কাব্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত সুফী ভাবের জন্য কোন স্থানে অশ্লীলতা নেই।'[১৫] কাব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বলেন, "বাহরামের কবি প্রতিভা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাহার কাব্যে যে সব ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, খর্বছন্দ, জমক ছন্দ, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি।'[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

'লায়লী মজনু' কাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে ড. আহমদ শরীফ 'এর যুগদুর্লভ' ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে, যথার্থ ট্রাজেডি, প্রায় অলৌকিকতামুক্ত, আশ্চর্যভাবে অশ্লীলতামুক্ত, মানবিক প্রণয়োপাখ্যান (আধ্যাত্ম রূপকের পরিবর্তে), অনুবাদের পরিবর্তে লোকশ্রুত পুরোনো কাহিনীর স্বাধীন অনুসৃতি ও গীতনাট্যে নায়কের বারবাসী বর্ণনা। মধ্যযুগের রচনা হিসেবে দৌলত উজীর বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' লালিত্য ও সৌন্দর্যবোধের এক অনন্য উপাখ্যান। কবির কাব্যাত্মার প্রতি ইঙ্গিত করে ড. এনামুল হক বলেন, 'সংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে, নিছক কাব্যরস, লিপি চাতুর্য, ভব্যতা ও শালীনতায় 'লায়লী মজনু'র সমকক্ষ কাব্য খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে একটিও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' [১৮]

মুহম্মদ কবীর

ষোড়শ শতকের শেষ অব্দের কবি মুহম্মদ কবীর। মধুমালতীর প্রধান কবি মুহম্মদ কবীর। কবিত্ব, রচনাশৈলী ও কাব্য সৌন্দর্যের দিক দিয়ে অন্যান্য কবির তুলনায় মুহম্মদ কবীর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন।[১] প্রাপ্ত পুঁথিতে কবির ব্যক্তি পরিচয় নেই। কাব্যে কালজ্ঞাপক কোন উক্তি নেই। চট্টগ্রামের কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ড. আহমদ শরীফ কবিকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে মনে করেন। পুঁথির ভণিতার উপর নির্ভর করে ড. এনামুল হক বলেন, '১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে কবি মুহম্মদ কবীর 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন?"[২] তিনি কাব্যের ভাষা বিশ্লেষণ করে মুহম্মদ কবীরকে বিজয়গুপ্ত বা বিপ্রদাসের সমসাময়িক বলে মনে করেছেন।[৩] তাছাড়া "সরস্বতী বন্দনা, বাঙলা ভাষা অর্থে 'হিন্দুয়ালী শব্দের প্রয়োগ ভাষার প্রাচীনতাজ্ঞাপক শব্দাবলীর ব্যবহার কাজী দৌলতের কাব্যে উপাখ্যানটির উল্লেখ, পয়ার, ত্রিপদী ছন্দে অসমাক্ষর প্রয়োগ প্রবৃত্ত থেকে আমাদের মনে হয়, কবি মুহম্মদ কবীর আমাদের প্রাচীন কবিদের একজন।"[৪] কাব্যের একটি পাঠ অবলম্বনে ড. আহমদ শরীফ ও ড. এনামুল হকের ব্যাখা বিশ্লেষণে মন্তব্য করেছেন। তবে এটা যে ষোল শতকের পরের রচনা নয়, তা এক রূপ

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিতভাবে বলা চলে।'[৫] ড. সুকুমার সেন, 'মুহম্মদ কবীরের কাব্যকে উনিশ শতকের রচনা বলেছেন।[৬] 'মধুমালতী' ভারতীয় উপাখ্যান-হিন্দুয়ানী জীবনাশ্রয়ে প্রেমকাহিনী বিবৃত হয়েছে'[৭] হিন্দি কবি মনঝন হিন্দিতে 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেন।

মুহম্মদ কবীর মনঝনের কাব্য অনুসরণে লিখেছেন বলে মনে হয়। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। পুঁথিতে এ বিষয়ে দুটি ভণিতা উল্লেখ করার মত-

ক. মোহাম্মদ কবিরে কহে মনে কুতুহলি ।
আছিল ফারসি ছন্দ রচিল পাঞ্চালি

খ. মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি
আছিল ফারসি কিতাব করিল হিন্দুয়ালী

মধুমালতী কাব্য রোমান্স রসে ভরপুর। সৈয়দ আলী আহসান মনে করেন, মধুমালতী কাব্যটি হিন্দী কবি মনঝনের কাব্যের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ'

ড. এনামুল হক মনে করেন- "মনে হয় মূল গল্পটি হিন্দীতে ছিল, কোন ভারতীয় মুসলমান কবি আমীর খসরুর ন্যায় হিন্দি হইতে গল্পটিকে ফারসি ভাষার কাব্যিক রূপ দিতে গিয়ে পরী প্রভৃতি ইরানী উপাদান ঢুকাইয়া দেন। এই ফারসী কাব্য হইতেই বাংলায় কবি মুহম্মদ কবীর গল্পটি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।"[৮] ড. মমতাজুর রহমান তরফদার মনে করেন- 'মধুমালতী' কাব্যের উপজীব্য ছিল ১৬৪৯ সালে রচিত ফারসি কাব্য 'কিস্‌সা-ই-মধুমালতী 'ওয়াকুঙুর মনিহর'[৯] সেহেতু ফারসি মূল কাব্য ১৬৪৯ তে রচিত, সুতরাং কবীরের কাব্য সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে বা অষ্টাদেশ শতকের প্রথম ভাগে হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

'মনোহর-মধুমালতী' রোমান্সধর্মী আখ্যান রূপে জনসাধারণের নিকট বেশ জনপ্রিয় ছিল। অনুবাদ বা অনুসরণ করা হলেও কবীরের কাব্যটিতে কবিত্বের বেশ প্রাখর্য পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপে 'মনোহর-মধুমালতী'র উপাখ্যানটি হচ্ছেড় কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভান ও রাণী কমলার পুত্র যুবরাজ মনোহর। পনের বছর বয়সে মনোহর ও মহারস-রাজকন্যা মধুমালতীর মধ্যে পরীদের আত্মতৃপ্তিদায়ক চক্রান্তে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। মনোহর উদ্যানে পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লে পরীরা মধুমালতীর পালঙ্কের পাশে নিয়ে যান। জেগে ওঠে দুজনের মধ্যে আলাপ হয়। এবং অঙ্গুরী বিনিময় করে। পরীরা যথাস্থানে তাদের রেখে যায়। সকালে উভয়ে জেগে ওঠে পরস্পরকে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে। মনোহর মধুমালতীকে পাওয়ার জন্য সসৈন্যে অভিযানে বের হয়। পথে অপর রাজকন্যা পায়মার সাথে সাক্ষাৎ হয়। পায়মা এক দৈত্য দ্বারা অপহৃত হয়ে বন্দী ছিল। মনোহর যুদ্ধে দৈত্যকে পরাজিত করে তার পিতার কাছে পৌঁছে দেন। সেখানে মনোহর মধুমালতীর দেখা পান কিন্তু কলঙ্কের আশংকায় মধুমালতীর মা মন্ত্রবলে মধুমালতীকে পাখি বানায়। শুকপাখি মধুমালতী উড়ে গিয়ে রাজা তাঁরা চাদের হাতে পড়েন। রাজা পাখির মুখ থেকে সব কথা শুনে তাকে মহারস রাজ্যে পৌঁছে দেন। মহারস রাজাও তারা চাঁদের সব কথা শুনে মনোহর-মধুমালতীর পরিণয়-বন্ধন ঘটান।

অলৌকিক ঘটনার মধ্যেও কাব্য-কাহিনীটি পাঠককে স্পর্শ করে। ড. এনামুল হক বলেন, 'মুহম্মদ কবীরের বর্ণনা ভঙ্গী অত্যন্ত চমৎকার। তাঁহার এই কাহিনী কাব্য খানি আখ্যানের সৌন্দর্যে ও বর্ণনার মাধুর্যে পরম উপভোগ্য।'[১০] কাব্যটির জনপ্রিয়তার অনন্য কারণ হল এর অন্তধর্মী শান্ত ও সৌম্য রস। ড. ওয়াকিল মনে করেন, 'ভাষা সৌকর্য সাধনে কবীর উত্তীর্ণ। ললিত মধুর ধ্বনি সুষমা ভাষা, ছন্দ ও অলংকার সুশোভিত হয়ে কাব্যখানি খুব সুখপাঠ্য হয়েছে।'[১১]

Dhaka University Institutional Repository

সাবিরিদ খান

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি হিসেবে সাবিরিদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে কবির নাম শাহ ফরিদ খান মনে করেন। তবে কবির সব ভণিতায় নামের বানানে "সাবিরিদ" পাওয়া যায়। কবির তিনখানি কাব্য পাওয়া গেছে। কাব্যগুলো হল, বিদ্যাসুন্দর, হানিফা-কয়রাপরী ও রসুল বিজয়। প্রথমদুটি প্রণয়-আখ্যান। তাঁর তিনখানি গ্রন্থ খণ্ডিত আকারে আবিস্কৃত হয়েছে। কবির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।" বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এক স্থলে তিনি ভণিতায় অল্প বংশ পরিচয় দিয়েছেন।[১] সে সূত্রে, কবির পিতা নানুজান মল্লিকের কৃতিত্বে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ইছাপুর পরগণায় নানুপুর স্থাপিত হয়।[২] কবির অনুলিখিত পুঁথিগুলো চট্টগ্রাম থেকে আবিস্কৃত হওয়ায় এখানেই কবি জীবন কাটিয়েছেন বলে মনে হয়। ড. আহমদ শরীফের মতানুসারে, "সাবিরিদ খান ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।"[৩] ড. এনামুল হক কবির ভাষার প্রাচীনত্ব বিচারে বলেন, 'তাঁহার ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিককার ভাষা' বলে মনে হয়। আদি মধ্যযুগের ভাষা হলেও তাঁর কাব্যে অনন্য ভাষা শক্তি আরোপিত হয়েছে কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্যের মাধ্যমে।[৪] ড. আহমদ শরীফ সাবিরিদ খানের কাব্যের ভণিতা পর্যবেক্ষণ করে স্থির হন যে, "১৪৮০ থেকে ১৬৬৩৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই যে সাবিরিদ খান বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা একরূপ নিঃসংশয়।"[৫]

"বিদ্যাসুন্দর' সংস্কৃত সাহিত্য প্রভাবিত আদি রসাত্মক প্রেমের আখ্যান।[৬] তিনি বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি রচয়িতা। 'বিদ্যাসুন্দর নিছক মানবীয় প্রেমের কাহিনী।' লৌকিক মানসভূমি থেকে এটি উদ্ভূত হয়নি; শিক্ষিত কবির চিন্তার ফসল।'[৭] বাঙালী হিন্দু মানসিকতায় কালিকামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল কাব্যে এর অস্তিত্ব ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের প্রাচীন উৎস হল 'কাশ্মীরের কবি বিহলন রচিত সংস্কৃত 'চৌর পঞ্চাশিকা'।[৮] এছাড়া বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নিয়ে সংস্কৃতে বররুচি, বাংলাতে দ্বিজ শ্রীধর ও কবি কঙ্ক কাব্য রচনা করেন।[৯] কাব্যে আগাগোড়া পীরের মহিমার কথা আছে, কালিকার নাম গন্ধ নেই।[১০]

ড. আহমদ শরীফ, সাবিরিদ খানের প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন- 'ভাষা ও উপমা- অলংকারের সংযত ব্যবহারে আর পদলালিত্যে ও ছন্দ সৌন্দর্যে গোটা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় জুড়ি নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।"[১১] অথচ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পদলালিত্য ও ছন্দ গৌরব সত্ত্বেও অনেক সময় অতি কথনের দোষে আমাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়।[১২] কিন্তু সাবিরিদ খানের অনন্য সাধারণ ললিত মধুর রচনা পাঠক মাত্রকেই চমৎকৃত ও বিস্মিত করে।[১৩] ড. ওয়াকিল আহমদ কবির ভাষা সম্পর্কে বলেন, 'সাবিরিদ খানের ভাষা সংস্কৃতানুগ বিশুদ্ধ এবং পরিমার্জিত'। স্থান বিশেষে ভাষার আবেগ আছে, কিন্তু গতি ব্যঞ্জনা তেমন নেই।'[১৪]

সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দর কব্যের কাহিনী সংক্ষেপ নিম্নরূপ, রত্নাবতীর রাজা গুনজার। রাজা ও রাণী দুজনে রাজকর্ম ও ধ্যানদান করেন। কিন্তু তাদের দুঃখ কোন সন্তান নেই। রাণী কলাবতী রাজাকে গভীর ধ্যানে মগ্ন করালেন। দেবী পার্বতীর বরে কলাবতী গর্ভবতী হয়ে পুত্র সন্তান লাভ করেন। নাম রাখা হল সুন্দর। চার বছরেই সে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠল। অন্যদিকে কাঞ্চিপুরের রাজা বীর সিংহের কন্যা পদ্মাবতী অল্প সময়ে পান্ডিত্য অর্জন করল। যথাসময়ে তার পরিণয়ের ব্যবস্থা করেন। ঘটকের মুখে বিধ্যার রূপ ও পাণ্ডিত্য শুনে সুন্দর এক মালিনীর গৃহে আশ্রয় নিয়ে রত্নাবতীর গুণ সম্পর্কে জানতে পারে। 'কবি স্বয়ং বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে গর্বিত বলেছেন।' এ শ্রেণীর রচনায় অভিনয় ধর্ম থাকে। সংলাপ ও ক্রিয়া দ্বারা তা একটিও হয়।" শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মত এ কাব্যে মঞ্চনির্দেশ, দৃশ্য সংকেত ও রূপসজ্জার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হানিফা-কয়রাপরী সাবিরিদ খানের 'জঙ্গনামাধর্মী কাব্য' হলেও প্রেম কাহিনীর জন্য তা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অন্তর্গত। কাব্যটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। ড. আহমদ শরীফ কাব্যটিকে নামকরণ করেছেন 'হানিফার দিগ্বিজয়',[১৫] আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ এর নাম দেন মোহাম্মদ হানিফা ও কয়রাপরী' ড. এনামুল হক 'হানিফা ও কয়রাপরী' নামে এর সাহিত্য মূল্যবিচার করেন।

হযরত আলীর পুত্র মুহম্মদ হানিফা কাহিনীর নায়ক। জয়গুনের সাথে পরিণয় হয়ে উভয়েই অনেক রাজাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাদের এই বীরত্ব কাহিনী ছাড়াও হানিফার সঙ্গে কয়রাপরীর প্রণয়কাহিনী এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি প্রেমকাহিনীভিত্তিক হলেও যুদ্ধসর্বস্ব। হানিফা-জয়গুণ- কয়রাপরীর প্রণয়কাহিনী বিসর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়ে রোমান্সের পর্যায়ে উঠেছে। যুদ্ধের মাহাত্ম্য কাব্যের প্রেমকে স্তিমিত করে দিয়েছে। কাব্য প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন, 'কবির বর্ণনাভঙ্গি বিবৃতিসর্বস্ব। বিদ্যাসুন্দরের গীতি ধর্মীতার ও নাটকীয়তার যে রূপ সমন্বয় দেখা গেছে, হানিফা কয়রাপরীতে তার কণামাত্র রক্ষিত হয়নি।"[১৬] মূলত কবি রোমান্টিক শিল্পচেতনার প্রভাবে ইসলাম প্রচারের সুলভ পন্থা আবিষ্কার করেছেন।

দোনাগাজী

বাংলা প্রণয়োপাখ্যান ধারার বিশিষ্ট কাব্য 'সয়ফুলমূলুক বদিউজ্জামাল'। কাহিনীর আদি উৎস আরবি আলেফ লায়লা। পরবর্তীতে ফারসি ও তুর্কি ভাষায় রচিত হয়। এ কাহিনী অনুসারে বাংলায় দোনাগাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্রাহিম ও মালে মুহম্মদ কাব্য রচনা করেন।[১] দোনাগাজী কবি আলাওলের পরবর্তী কবি। কবির আত্মপরিচয় জ্ঞাপক কোন ভণিতা কাব্যে নেই। পুঁথিখানি ত্রিপুরা জেলা হতে সংগৃহীত।[২] 'কবি দোনাগাজী ত্রিপুরা জেলার বর্তমান চাঁদপুর মহকুমার কোন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন'।[৩] দোনাগাজীর কাব্যে

Dhaka University Institutional Repository

বিরহিমের ভণিতা রয়েছে তিনবার-আর দোনাগাজীর চারবার। কবির সংগৃহীত পান্ডুলিপির ভণিতায় পাওয়া যায়-

'দোনাগাজী চৌধুরী দেল্লাই নামে
দেশ রাচিল বিরহ পুঁথি চিত্তের আবেশ"

এ থেকে ড. আহমদ শরীফ মনে করেন 'দেল্লাই দেশ বা পরগণা ছিল আধুনিক কুমিল্লা জেলায়।'[৫] পান্ডুলিপির প্রাচীনতার ও ভণিতা দেখে কবিকে 'সতের শতকের'[৬] কবি মনে করা হয়েছে। কাব্যের কাহিনী উৎস 'আলেফ লায়লা' হলেও কবি তাঁর নিজস্ব রুচি, কল্পনা, স্বভাব ও ভাবভঙ্গিতে আলাদা করেছেন। অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা, কাহিনী বিস্তার ও চরিত্রের নামগত পার্থক্য কাব্যটিতে প্রবল। ভারতীয় কবি মাহফিল, ১৬১০ সালে, এ ধরনের কাব্য রচনা করেন। দোনাগাজীর কাব্যে বিরহিমের ভণিতা পাওয়া যায়। কাব্যটির জনপ্রিয়তার কারণে সম্ভবত গায়েন কবি অমরত্ব লাভের আশায় নিজ নাম যুক্ত করে দিয়েছিলেন। বিরহিম ছিলেন উনিশ শতকের দোভাষী শায়ের কবি। দোনাগাজীর কাব্যটি অধিক জনপ্রিয়তার কারণে অনেকে কাব্যটি ভাষান্তরিত করেছেন। ফলে মূল আখ্যানের সাথে যথেষ্ট তারতম্য ঘটেছে। দোনাগাজীর কাব্যের সাথে আলাওলের কাহিনীর কোন ছায়াপাত নেই। ড. এনামূল হক, কবির কালনির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের ধারণা, কবি দোনাগাজী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাহার ভাষায় প্রাকৃত ভাব, ছন্দের শিথিলতা, অন্ত্যানুপ্রাসের শৈথিল্য এবং প্রাচীন শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য সমস্ত একসঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতার যুগের মুসলিম কবিদের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।"[৬] কবি ফারসি কাব্য অনুসরণে কাব্যটি রচনা করেন। প্রেমমূলক কাহিনী কাব্য হিসেবে এর পরিচয়। 'আলেফ লায়ল্যার ৭৫৭ তম রজনী থেকে শুরু ৭৭৮ তম রজনী পর্যন্ত অংশে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পরীরাজ কন্যা বদিউজ্জামালের ছবি দেখে মিশররাজার পুত্র সয়ফুলমুলক তার প্রেমে পড়ে যায়। মন্ত্রীপুত্র সায়েদের সহায়তায় বহু বাধা অতিক্রম করে সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামালের সাক্ষাৎ পায় এবং পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। সায়েদ বদিউজ্জামালের সখী মল্লিকাকে বিয়ে করে। কাব্যের কাহিনী রূপকথায়

Dhaka University Institutional Repository

ভরপুর। কবি মূলকাহিনীর প্রতি অঙ্গ অনুসরণ করেননি। রূপকথা ও অলৌকিকতার কারণে কাব্যটি রোমান্সের দিক থেকে প্রাচীনধর্মী। তবুও 'রোমাঞ্চকর ঘটনামিশ্রিত প্রেমপূর্ণ আখ্যানরসেই সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল কাব্যের শিল্পগত মূল্য নিহিত আছে।[৮] দোনাগাজীর কাব্যে আদি রসাত্মক চেতনার বিস্তার আছে। তবুও তাঁর কাব্যে ষোড়শ শতকের মুসলিম সমাজের জীবন্ত ছবি আছে। তার বাস্তব মুখী দৃষ্টি চেতনায় কোন কৃত্রিমতার ছাপ ছিল না। তাই তাঁর কাব্যে সমাজ জীবনের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও উৎসবের বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত হয়। কবি দোনাগাজীর কাব্যমূল্য বিচার প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদের মন্তব্য- 'দেনাগাজীর কাব্য আদি রসাত্মক। নরনারীর সম্ভোগচিত্রে অশণ্টীলতার পরিচয় আছে। কবির বর্ণনা অত্যন্ত নগ্ন, স্থুল ও কামোদ্দীপক। এতে কাব্যের শিল্পসৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে।'[৯]

আলাওল

মধ্যযুগের সতের শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। 'জ্ঞানের প্রাচুর্যে, শব্দ সম্ভারের ব্যাপকতায়, বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানের দক্ষতায় ও কুশল শিল্পচর্চায় আলাওলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। "[১] বাংলা সাহিত্যে আলাওল বৃহত্তর প্রতিভা। 'সে প্রতিভা বহুমুখী, সঙ্গীতে, নৃত্যে, দর্শনে বহু বিষয়ে তা স্বচ্ছন্দ, ভাবেশ্বর্যে তার প্রেমগভীর সুফী প্রেমোন্মাদনা ও রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার সংযোগে তা চিত্তস্পর্শী।'[২] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'বাস্তবিক এই মুসলমান কবির সমকক্ষ ভাষাবিদ সেই যুগে কোন কবি ছিলেন না, এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে।'[৩]

আলাওলের কাব্যে তাঁর আত্মবিবরণী বর্ণিত আছে। তিনি প্রথম জীবনে ভাগ্যচক্রে নির্মম কষ্ট ভোগ করেন এবং ভাগ্যগুণে রোসাঙ্গ রাজসভায় উচ্চপদে আসীন হন। কবির জন্মস্থান ও জন্মকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও কবি 'পদ্মাবতী' কাব্যে আত্মপরিচয় অংশে তার সমাধান দিয়েছেন। উদ্ধৃতিটি হলো-

Dhaka University Institutional Repository

মূল্লুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান
তথাতে জালালপুর অতিপূণ্য স্থান।'

উপরের উদ্ধৃতি আলোকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত-'এই ফতেহাবাদ বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা ছিল।[৪] তিনি মনে করেন জালালপুরই কবির জন্মস্থান ছিল। ড. এনামুল হক ও ড. আহমদ শরীফ উভয়েই উল্লিখিত কবির জন্মস্থানকে মেনে নিতে পারেননি। ড. শরীফ বলেন, 'কিন্তু বর্ণনায় স্পষ্টত ফতেহবাদকে কেবল পিতার কর্মভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ড. এনামুল হক মনে করেন, 'তিনি (আলাওলের) ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিশ কুতুবের অমাত্যপুত্র ছিলেন। এই ফতেয়াবাদ ফরিদপুর জেলার সরকার ফতেয়াবাদ নহে বলিয়া আমার ধারণা। ড. গোপাল হালদার বলেন, এ মূল্লুক তবু কোথায় বলা এখন দুঃসাধ্য। ফতেয়াবাদ নিম্নবঙ্গের কোথাও হবে, ফরিদপুরেও হতে পারে।' ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, আলাওল কবি ফতেয়াবাদ পরগণার (ফরিদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি আমসের কুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও ড. এনামুল হক কবিকে চট্টগ্রাম নিবাসী মনে করে। সুকুমার সেন বলেন- 'সুতরাং ইহা পশ্চিম অথবা মধ্য বঙ্গে হওয়াই বেশী সম্ভব।' কিন্তু সৈয়দ আলী আহসান সাহিত্য বিশারদ ও হকের বিপক্ষে মতামত দিয়ে বলেন, কবি, 'প্রথম জীবন ফতেহাবাদে কাটিয়েছেন এবং অবশিষ্ট জীবন আরাকানে কাটিয়েছেন।' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতানুসারে, কবি আলাওলের জন্ম আনুমানিক ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং সম্ভবত ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।' ড. এনামুল হক কবির জীবৎকাল ১৬০৭ থেকে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ মনে করেন। ড. আহমদ শরীফ, ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে আলাওলের জন্ম সাল ধরেছেন আর মৃত্যুকাল অনুমান করেছেন ১৬৭৩ থেকে ১৬৮০ এর মাঝামাঝি। সৈয়দ আলী আহসানের মতে, 'কবির জন্ম ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে।

Dhaka University Institutional Repository

কবি আলাওল পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, সতীময়না, ও সপ্তপয়কর নামে প্রণয় কাব্য রচনা করেন। পদ্মাবতী আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। হিন্দী কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ। জায়সী ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কাব্যটি রচনা করেন। পদ্মাবতী পদুমাবতের স্বাধীন অনুবাদ। কাহিনী রূপায়ণ, চরিত্র চিত্রণ, প্রকাশভঙ্গী প্রয়োগে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর মৌলিকত্ব ধরা পড়ে। 'পদ্মাবতী' প্রেমমূলক ঐতিহাসিক কাব্য হলেও এতে প্রেমের স্বরূপই বেশি। 'পদ্মাবতী' চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাহিনী নিয়ে রচিত। অপূর্ব সুন্দরী 'পদ্মাবতী' রত্নসেনের স্ত্রী। রত্নসেনের দরবারে রাঘব চেতন নামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনকে পদ্মাবতীকে হরণ করতে প্ররোচিত করেন। সম্রাট রত্নসেনের নিকট অনুরূপ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁকে বন্দী করেন। পরে দেওপালের সাথে রত্নসেনের যুদ্ধ বাঁধে এবং রত্নসেন আহত হয়। এ সুযোগে সম্রাট আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। ইতোমধ্যে রত্নসেনের মৃত্যু ঘটলে পদ্মাবতী সহমৃতা হন। বিজয়ী সম্রাট চিতোর পৌছে তাদের জ্বলন্ত চিতা দেখতে পান এবং চিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিল্লি ফিরে যান।

জায়সীর কাব্য ছিল রূপক। আলাওল রোমান্টিক কাব্যের আড়ালে সুফী আধ্যাত্মতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ড. আহমদ শরীফ বলেন, 'আলাওল সংস্কৃত শব্দের, ছন্দের ও অলংকারের প্রয়োগে সুষম সুন্দর কাব্যসৌধ নির্মাণে ছিলেন নিষ্ঠ। পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সমভাবে বিদ্যমান। নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের কারণে ড. সুকুমার সেন আলাওলের অনুবাদ মূলের অতিরিক্ত মূল্য পেয়েছে বলে মনে করেন। কবি সংস্কৃত কাব্যের লালিত্য ও মাধুর্যকে পদ্মাবতী কাব্যে চমৎকার শিল্পকুশলতার সঙ্গে সংযোজিত করেছেন।

আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল।' আরাকান রাজ্যের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের উৎসাহে কবি '১৬৫৮ তে কাব্য রচনা শুরু করেন এবং মাগন ঠাকুরের

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর পরে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তা সমাপ্ত করেন।' কবি 'আলেফ লায়লার' ফারসি অনুবাদ অবলম্বনে কাব্যটি রচনা করেন। জীবনের শেষ দিকে রচিত এ কাব্যে কবি যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে একে মৌলিক রচনা মনে করেন।

দৌলত কাজীর 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' কাব্যের অবশিষ্টাংশ আলাওলের তৃতীয় রচনা। আরাকানরাজ সোলেমানের আগ্রহে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যটি সমাপ্ত করেন। 'সপ্তপয়কর' আলাওলের চতুর্থ রচনা। কাব্যটি পারস্য কবি নিজামী গঞ্জভীর 'হপ্তপয়কর' কাব্যের অনুবাদ। এটিও কবির ভাবানুবাদ কাব্য। আরাকান রাজ্যের সমরমন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে ১৬৬০ এ কাব্যটি কবি রচনা করেন।

কবি আলাওলের কাব্যসাধনা মূলত অনুবাদমূলক। তবে তাঁর অনুবাদ মৌলিক রচনার স্পর্ধা রাখে। জ্ঞানের প্রাচুর্যে, শব্দ সম্ভারের ব্যাপকতায়, ভাষা-জ্ঞানের দক্ষতায় ও শিল্পকুশলতায় আলাওলের শ্রেষ্ঠত্ব ঈর্ষণীয়।

'সেকেন্দার নামা' আলাওলের সর্বশেষ কাব্যরূপ। আরাকান রাজসভার অমাত্য নবরাজ মজলিশের সময় ১৬৬৪ তে কাব্যটি রচিত। কবি নিজামীর ফারসী কাব্য' ইসকন্দর নামা'র অনুবাদ এ কাব্য। ইরানে প্রচলিত আলেকজান্ডারের বিজয় অভিযানের কাহিনী এর উপজীব্য।

তাঁর রচনা অনুবাদমূলক হলেও প্রধানত তৎসম শব্দ ব্যবহারে, বাংলা ছন্দ পরিচর্যায়, জ্ঞান ও বুদ্ধির নতুন সংযোজনে তিনি মৌলিক কবি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ড. এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন, 'মহাকবি আলাওল একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে নতুন প্রাণ লাভ করিয়াছিল। ..... অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ।' ড. ওয়াকিল আহমদ মনে করেন, 'অন্যান্য কবির গুণগুলো কম বেশি আলাওলের মধ্যে আছে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

আলাওলের সব গুণ একত্রে কোন কবির মধ্যে নেই। ... কবিত্বের সামগ্রিক বিচারে আলাওল 'মহাকবি' আখ্যায় ভূষিত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য।"

কোরেশী মাগন ঠাকুর

আরাকান রাজসভার খ্যাতিমান কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি ছিলেন আলাওলের পৃষ্ঠপোষক। মাগন কবির ডাক নাম। মাগন ঠাকুর আরাকানের অধিবাসী হলেও তার জন্মস্থান ছিল চট্টগ্রামের চক্রশালায়। ড. মুহম্মদ এনামূল হক মনে করেন, কবি আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোরেশ বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ছিলেন।'[১] মাগন রাজপুত্র ছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে, তাছাড়া সে সময় মুসলমান নামের শেষে 'ঠাকুর' যুক্ত থাকত। মাগনের পিতাও ঠাকুর পদবী লাভ করেছিলেন। ড. আহমদ শরীফ বলেন, 'কবি কোরেশী মাগন ঠাকুরের প্রপিতামহ ছিলেন আরব থেকে আগত কোরেশ ...এ চক্র শালার বসতি স্থাপন করেন।"[২]

'চন্দ্রাবতী' কাব্য কবি মাগন ঠাকুরের একটি প্রণয়োপাখ্যান। তিনি বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত ও কাব্যরসিক ছিলেন। কবি বাংলাদেশে প্রচলিত রূপকথার কাহিনী নিয়ে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপ- ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান সরন্দ্বীপ রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর চিত্র দেখে বিমুগ্ধ হন। চন্দ্রাবতীর সাথী চিত্রাবতী রূপসী চন্দ্রাবতীর সুন্দর ছবি তৈরি করে চন্দ্রাবতীর নাম ঠিকানা লিখে উড়িয়ে দেয়। সেটি ঘুমন্ত কুমারের বুকে গিয়ে পড়ে। রাজপুত্র জেগে ওঠে চিত্রপট দেখে চন্দ্রাবতীর সন্ধানে নাগের বাঘের-যক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জয়ী হয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তীর্ণ করে চন্দ্রাবতীকে লাভ করে।

চন্দ্রাবতী কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. এনামুল হকের মতামত- 'চন্দ্রাবতী কাব্যখানি কবিত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও কাব্যকলার চরম নিদর্শন না হইলেও, তাহার স্থানে স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তার ন্যায় কবিত্ব ছড়াইয়া রহিয়াছে।[৩] ড. আহমদ শরীফ মনে করেন, 'মাগনের ১৬৫৮ সনের শেষে বা ১৬৫৯ সনের গোড়ার দিকে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়।[৪]

আবদুল হাকিম

সতের শতকের কবি আবদুল হাকিম। তিনি 'ইউসুফ জোলেখা' ও 'লালমতী সয়ফুলমূলুক' নামে দুটি প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। কবির জন্ম স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে ড. এনামুল হক বলেন-'বিভাগ পূর্ব নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপের সুধারামে কবির জন্ম হয়। ৫ ড. রাজিয়া সুলতানার অভিমত, 'কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল বাবুপুর বর্তমানে নোয়াখালী জেলার ফেনী ও বেগমগঞ্জের নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম।... কিন্তু এককালে বাবুপুর ভুলুয়া রাজ্যের অধীন একটি সমৃদ্ধ পরগনা ছিল।'[৬] কবির পিতাও একজন নামকরা কবি ছিলেন। কবির জীবনকাল প্রসঙ্গে ড. এনামূল হক বলন, 'কবি হাকিমের কালিক অবস্থান ১৬২০ থেকে ১৬৯০ পর্যন্ত ছিল। অপর দিকে ড. রাজিয়া সুলতানা মনে করেন, 'কবি আবদুল হাকিম আনুমানিক ১৬০০-১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।'[৮]

কবি ফারসি কবি জামীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য অনুবাদ করেছিলেন। কবির রচনারীতি ছিল বিবৃতিধর্মী, ভাষা প্রাঞ্জল হলেও ব্যঞ্জনাময় নয়। কবির অপর প্রণয়োপাখ্যান হল 'লালমতী সয়ফুলমূলুক।' এটিও ফারসি কাব্যের অনুবাদ। ইউসুফ জোলেখা কবির প্রথম কাব্য এবং 'কাব্যটি' সম্ভবত ১৬২৫ থেকে ১৬৪৫ এর মধ্যে কোন এক সময় রচিত হয়েছিল। আনুমানিক ১৬৪৭ সালে 'লালমতী সয়ফুল মূলুক' কাব্য রচিত হয়। কবি আবদুল হাকিমের নামে মোট আটখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। পুঁথিগুলো হচ্ছে ইউসুফ- জোলেখা, 'লালমতী-সয়ফুল মূলুক, শিহাবুদ্দীন নামা, নূর নামা, নসিহত নামা, চারি মোকামভেদ, কারবালা ও শহরনামা।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াজিস খান

বাংলায় 'গুলে বকাওলী' কাব্যের রচয়িতা হিসেবে নওয়াজিস খ্যাতিমান কবি হিসেবে পরিচিত। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, তাঁর এক পূর্ব পুরুষ ছিলিম খান গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এসে ছিলিম পুর গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সুখছড়ি গ্রামে বসবাস করতেন বলে জানা যায়। 'গুলে বকাওলী' কবির বিখ্যাত কাব্য। এর রচনাকাল সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মনে করেন, কবি নওয়াজিস খান ১৭৩০ থেকে ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা চলে।' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'কবি নওয়াজিস খান কাব্যটি ফারসি থেকে অনুবাদ করেছিলেন। কাব্যের কাহিনী প্রেমমূলক। কাহিনী সংক্ষেপ- শার্কিস্তানের রাজপুত্র তাজুলমূলুক পিতার অন্ধত্ব দূর করার জন্য বকাওলী ফুলের সন্ধানে যায়। সেখানে রাজকন্যা বকাওলীর নিদ্রিতাবস্থায় তাজুলমূলুকের অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়। বকাওলী তাজুলের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়। তাঁর কাব্য বিবৃতিধর্মী রচনা হলেও রচনাভঙ্গির স্বচ্ছলতা আছে। 'সুললিত ধ্বনি বিন্যাসে কবির লিপিকুশলতার' পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নওয়াজিস খানের প্রকাশভঙ্গি প্রাণহীন ও পরিচর্যাহীন নয়। বরং ছন্দে-বন্দে-অলংকারে ধ্বনি সুষমায় কবির সতর্ক প্রয়াসে আনন্দাস্বাদ লাভ করা যায়। বাংলা ভাষাব্যাতীত হিন্দি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি ভাষাতেও "গুলে বকাওলী, কাব্য রচিত হয়েছিল।

তথ্য নির্দেশ:

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ- বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), পৃ. ২১।

২. ড. আহমদ শরীফ- সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, পৃ. ১২০।

৩. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ১৯।

৪. আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২২০।

৫. আহমদ শরীফ- সাহিত্য ও সংস্কৃতির চিন্তা, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত,পৃ. ২৭৪।

৭. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১২০ ঢাকা।

৮. ওয়াকিল- বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, পৃ.- ১৩৪, ১৪২।

৯. ড. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত,-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ , ১ম সংস্করণ ঢাকা- ১৯৮৭, পৃ. ৩৮।

১০. গোপাল হালদার- বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, পৃ. ৩৮।

১১. ড. ওয়াকিল- বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, পৃ. ১৬৫।

১২. ড. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য। পৃ. ১০৭।

১৩. ড. আহমদ শরীফ- বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খ পৃ. ১৬৩।

১৪. ড. ওয়াকিল আহমদ- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান পৃ, ৬০

১৫. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, পৃ. ২৮০।

১৬. ড. ওয়াকিল- প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

১৭. ড. ওয়াকিল- প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

১৮. উদ্ধৃত, মোঃ আবদুল হাফিজ. বাংলা রোমান্স কাব্য পরিচয়, পৃ. ১১

১৯. ড. এনামুল হক,-পূর্বোক্ত পৃ. ৭৫

২০. মোঃ আবদুল হাফিজ- পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩, ১৪।

তথ্য নির্দেশঃ শাহ মুহাম্মদ সগীর

১. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য- পৃ. ৪৪

২. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- পৃ. ২৬১

৩. ড. এনামুল হক,-প্রাগুক্ত-৪৪ সৈয়দ আলী আহসান- পৃ. ২৬৪, ড. ওয়াকিল আহমদ- পৃ. ১৬৬

৪. সৈয়দ আলী আহসান-পৃ. ২৬১

৫. ড. ওয়াকিল- পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৬. প্রাগুক্ত- পৃ. ১০৬,

৭. প্রাগুক্ত – পৃ. ১১২

৮. ড. এনামুল হক- মুসলিম, বাংলা সাহিত্য- পৃ. ৪৫

৯. ওয়াকিল-রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান-পৃ. ১১৯

১০. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়- বাংলার ইতিহাসের দু "শো বছর" স্বাধীন সুলতানদের আমল ১৯৮০ কলকাতা, পৃ. ৮৮ (৩য় সং)

১১. ওয়াকিল- প্রাগুক্ত – ১১২ / এনামুল হক রচনাবলী (২য়) পৃ. ৫১৩

১২. ড. এনামুল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৫০৮

১৩. প্রাগুক্ত-৫০৯ পৃ.

১৪. ড. ওয়াকিল- প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১৫. এনামুল হক রচনাবলী,২য় খণ্ড,৫১২ পৃ.

১৬. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য,৪৪ পৃ.

১৭. উদ্ধৃত, এনামুল হক রচনাবলী(২য়)পৃ. ৫১৫

১৮. উদ্ধৃত, এনামুল হক রচনাবলী,(২য়)খণ্ড-৫১৫

১৯. ড. এনামুল হক রচনাবলী(২য়)খণ্ড, পৃ. ৫৬২

২০. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান-১১২

২১. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা সাহিত্যের পূরাবৃত্ত- পৃ. ১৬৭

২২. ড. আহমদ শরীফ- বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ঢাকা পৃ. ৫০৭

২৩. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা সাহিত্যের পূরাবৃত্ত- ১৬৭

২৪. ড. ওয়াকিল আহমদ-পূর্বোক্ত -পৃ. ১৬৭

২৫. সাহ মুহম্মদ সগীর-ইউসুফ জোলেখা কাব্য

২৬. সৈয়দ আলী আহসান-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃ. ২৭০

২৭. ড. এনামুল হক- রচনাবলী (২য় খণ্ড),৫৬২ পৃ.

২৮. প্রাগুক্ত- পৃ. ৫৬২

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ: দৌলত উজির বাহারাম খান

১. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২২৮

২. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ৬৭

৩. সৈয়দ আলী আহসান-পূর্বোক্ত, ২২৮ পৃ.

৪. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য- পৃ. ৬৭

৫. ড. আহমদ শরীফ-বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮

৬. প্রাগুক্ত-১৮৮

৭. প্রাগুক্ত-১১৮

৮. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- পৃ. ২২৯

৯. লায়লী মজনু পৃ. ৩৪

১০. ড. ওয়াকিল আহমদ-বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান,পৃ১৩৮

১১. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ৬৮

১২. ড. আহমদ শরীফ-বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯

১৩. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পৃ. ২৩২

১৪. সৈয়দ আলী আহসান- প্রাগুক্ত-২৩৩

১৫. ড. আহমদ শরীফ- প্রাগুক্ত,পৃ. ১৯১

১৬. ড. শহীদুল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫

১৭. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) লায়লী মজনু পৃ. ১১

১৮. ড. মুহম্মদ এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ পৃ. ৬৮

তথ্য নির্দেশ: মুহাম্মদ কবির

১. উদ্ধৃত- ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পৃ. ১৯৮

২. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৬৯

৩. প্রাগুক্ত- ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

৪. ড. আহমদ শরীফ- প্রাগুক্ত, ১৬৯

৫. প্রাগুক্ত-১৭০

৬. ড. সুকুমার সেন- ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৫১

৭. ড. ওয়াকিল আহমদ-প্রাগুক্ত-১৯৮

৮. আহমদ শরীফ সম্পাদিত- মধুমালতী, পৃ. গ. ঘ ভূমিকা

৯. মমতাজুর রহমান তরফদার- পূর্বোক্ত, ২২৮।

১০. ড. এনামুল হক- প্রাগুক্ত-পৃ. ৭৩

১১. ড. ওয়াকিল- প্রাগুক্ত- পৃ. ২১৬

তথ্য নির্দেশঃ সাবিরিদ খান

১. ড. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য ও ড. আহমদ শরীফ-পুঁথি পরিচিতিতে এই বানানে কবির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন।

২. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ৫৬

৩. ড. আহমদ শরীফ- বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২ য় খন্ড ৫১৭ পৃ.

৪. ড. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৭৮

৫. প্রাগুক্ত- ৪১৯

৬. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান- পৃ. ১৭৭

৭. ওয়াকিল- প্রাগুক্ত- পৃ. ১৭৭

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খন্ড পৃ. ১৭৯

৯. ড. ওয়াকিল আহমদ-বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যায়-পৃ. ১৮৪

১০. প্রাগুক্ত- পৃ. ১৮৬

১১. শাবারিদ খান গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য

১২. শাবারিদ খান গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য-পৃ. ১২ ভূমিকা

১৩. ড. এনামুল হক -মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ড. ওয়াকিল - পূর্বোক্ত পৃ. ১৮৯

১৫. ড. আহমদ শরীফ- পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

১৬. ড. ওয়াকিল আহমদ- পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

তথ্য নির্দেশ: দোনাগাজী

১. আহমদ শরীফ- পুঁথি পরিচিত,পৃ. ৫৬৫

২. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য- পৃ. ৬২

৩. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য- পৃ. ৬২

৪. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,পৃ. ২৪৩

৫. আহমদ শরীফ-বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড,পৃ-২৩৮

৬. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য,পৃ. ৬২

৭. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পৃ.১৯২

৮. প্রাগুক্ত- পৃ. ১৯৬

৯. প্রগুক্ত-পৃ. ১৯৭

তথ্য নির্দেশ: আলাওল

১. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,মধ্যযুগ- পৃ. ২৪৪

২. গোপাল হালদার-বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা। পৃ. ৭২

৩. ড. শহীদুল্লাহ- বাংলা সাহিত্যের কথা(২য় খণ্ড),পৃ. ২৩৬

৪. ড. শহীদুল্লাহ- পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ: কোরেশী মাগন ঠাকুর

১. ড. মুহম্মদ এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৮, ঢাকা, পৃ.-২৪০

২. ড. আহমদ শরীফ- বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, ঢাকা, পৃ.- ৪৫১

৩. ড. এনামুল হক- এনামুল হক রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ. ৬২ (আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য)।

৪. ড. আহমদ শরীফ- পূর্বোক্ত ২য় খণ্ড পৃ.; ৪৫০।

৫. ড. এনামুল হক- পূর্বোক্ত- পৃ. ২০২

৬. ড. রাজিয়া সুলতানা- আবদুল হাকিমঃ কবি ও কাব্য, পৃ. ২০।

৭. ড. এনামুল হক- পূর্বোক্ত-পৃ. ২০৩।

৮. ড. রাজিয়া সুলতানা-পূর্বোক্ত পৃ. ৪৭

৯. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, ঢাকা- পৃ. ২৭৬

১০. ড. আহমদ শরীফ-পূর্বোক্ত-৫২০ পৃ.

১১. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ২০০১, ঢাকা পৃ.-৩৪৬

১২.পূর্বোক্ত- পৃ. ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দোভাষী পুঁথির প্রণয়োপাখ্যান ধারার রচনাশৈলী ও কবিকৃতি বিচার।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে এদেশে ইসলামী ভাবধারা প্রচারিত ও প্রভাবিত হতে থাকে। দরবারের ভাষা ফারসি এবং ধর্মীয় ভাষা আরবি হবার কারণে শাসক শ্রেণীর ব্যবহৃত ভাষা সর্বস্তরে প্রসার লাভ করে। মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলে পরিগণিত হবার পূর্বেও এদেশে হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত বিভিন্ন পাঁচালি কাব্য প্রচলিত ছিল। যা ছিল মুসলিম সমাজের একত্ববাদের বিপরীত। এমতাবস্থায় সুফী ভাব প্রভাবিত মুসলমান সাধকেরা ইসলামের আদর্শ প্রচারের স্বার্থে নতুন পন্থা খুঁজতে থাকে। এক সময় তাঁরা বাঙালি মানসকে প্রভাবিত করার মত ইসলাম ধর্ম সম্মত প্রচলিত ভাবাধারার সন্ধান পান। ফলে আরবি-ফারসি ঐতিহ্য ধারার সুফী ভাবধারা প্রসূত প্রণয়কাব্য তাঁরা ভাবানুবাদে অগ্রসর হল। এদেশে তখন জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক রীতিতে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী কাব্য বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ আলোকে তাঁরা কুরআন, ইসলামী ঐতিহ্য, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচলিত রীতিতে রচনা করতে উৎসাহী হল। এতে করে বাংলা সাহিত্যের ধারায় সৃষ্টি হয় নতুন এক স্বতন্ত্রধারা তথা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। মানবীয় অনুভূতি সম্পন্ন এসব কাব্য অচিরেই মানুষের হৃদয় জয় করে ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে তখনকার ধর্মশাসিত সাহিত্য জগতে এটা ছিল বিরল ও ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

মধ্যযুগের বিস্তৃত পর্বে বাংলার শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন আফগান তুর্কি বংশজাত মুসলমানরা। যার ফলে মুসলিম শাসক ও রাজন্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় পর্বে উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হয়।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে মুসলমানরা ছিলেন শাসক শ্রেণীর অনুগত ও পৃষ্ঠপোষণকারী ব্যক্তি। নবাবী আমল অবসানের পর মুসলিম সমাজে নেমে আসে অবক্ষয়, হতাশা, ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা। এ কাল পর্বে 'মুসলমান কবিরা আরবি ফারসি ও হিন্দী সাহিত্যের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী প্রণয়নের পৃথিকতের কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করেন।"[১] বিষয় বস্তুর একঘেঁয়েমীর কারণে স্বভাবতই জনসাধারণ এ কাব্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে বিশেষ করে মুসলমানরা। মধ্যযুগের পদ্যশাসিত কাব্যধারার ভাষারীতি ছিল সাধুরীতি। তৎসম বহুল শব্দ ব্যবহার করে সকল কাব্য রচিত হত। কিন্তু দোভাষী পুঁথিতে তৎসম শব্দের পরিবর্তে বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে আরবি- ফারসি, তুর্কি, হিন্দি শব্দ। যা অন্যান্য সব ধারার রীতির চেয়ে আলাদা। আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্যে এসব কাব্য মুসলিম ভাবরীতির পর্যায়ে পরিগণিত হয়। এ ভাষা রীতির কাব্যকে অনেকে নানা অভিধায় অভিসিক্ত করেছেন। তাঁদের অভিধায় ইসলামী বাংলা সাহিত্য, মুসলমানি বাংলা, মিশ্ররীতির কাব্য ও ইসলামী বাংলা প্রভৃতি নামে স্বীকৃতি পায়। ভাষারীতির ভিন্নতার কারণে এসব কাব্য প্রচলিত সব কাব্যের সাথে অমিল ছিল। এরূপ হবার কারণ হল আঠার শতকের প্রথম পাদে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হলে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বাণিজ্য ও কর্মসূত্রে অনেক হিন্দু-স্থানীও অবাঙ্গালী জনসাধারণের প্রবেশ ঘটে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া-হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ নানা অঞ্চলে। তাদের প্রভাবে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষায় হিন্দি,-উর্দু ভাষার প্রভাব বাড়তে থাকে। বাঙালি কথা ভাষায় ফারসি ও উর্দুর প্রভাবিত ভাষা তৎকালে হিন্দু-মুসলমান সকলেই প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে ব্যবহার করতেন। ফলে প্রচলিত ভাষায় কাব্যচর্চার চাহিদা অনুভূত হয়। যদিও এ ভাষারীতির প্রচলন ঘটেছিল ভারত চন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭৬০) সময়কালে। তিনি উৎকৃষ্ট রচনারীতির ধারক ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তবুও সমাজ-চাহিদার কথা অনুভব করে তাঁর। কাব্যে তিনি এ ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। তিনি একে যাবনী মিশাল (মানসিংহ কাব্যে ব্যবহৃত, ১৭৫২) ভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে এদেশের জনসাধারণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। কোন সুস্থ জীবনবোধ এ সময়ে বিদ্যমান ছিল না।'[২] সাহিত্য চর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ এ সময় দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে থাকে। দেশের সর্বত্র অরাজক পরিস্থিতির কারণে। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে। অন্যদিকে '১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারত চন্দ্রের মৃত্যুর পর মধ্যযুগীয় কাব্যদর্শও বিচলিত হয়েছিল। প্রথানুগত্য ও পরানুকরণের স্রোতে কাব্যের প্রাণবস্তু হারিয়ে যায়, দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর ভাগ্য বিড়ম্বনার ফলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভাবান কবিরা পৃষ্টপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নরুচিবান জনসাধারণের রসপিপাসা নিবৃত্তি করতে যেয়ে কাব্য ধারা অধোগতি লাভ করে।[৩] বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমান ও ভিন্ন দেশীয় মুসলমানদের যৌথ প্রভাবে এদেশীয় রীতিনীতির সমন্বয় ঘটে। বাংলার লৌকিক বৈশিষ্ট্য তারা বাদ দিতে পারেনি। এ সময় 'হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালির প্রভাবে মুসলিম মানসে একটা ভিন্ন প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে। [৪] মুসলিম জীবানাচরণে সৃষ্টি হতে থাকে হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর অনুকরণে মুসলিম আধ্যাত্মিক গৌরবময় ব্যক্তি মাহাত্ম্য। ধর্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে উদগ্রীব হয়ে ওঠে কিছু কিছু ইসলাম প্রেমীরা। তারা নানা উপায়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় নেমে পড়ে। ফলে অচিরেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল 'ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ-অনুসরণ, ইতিহাসের পটে কাল্পনিক কাফের-দলন-কাহিনী, পীরের কাছে দেবদেবীর পরাজয়বরণ ও পীরের প্রতিষ্ঠা লাভের উপাখ্যান বাংলায় রূপান্তরিত করার।[৫] 'মানবভাগ্য নিয়ন্তা বলে শ্রদ্ধা-শিরনী পেতে থাকেন সত্যপীর, বড়-খাঁ গাজী, ইসমাইল গাজী, বনবিবি প্রভৃতি।"

মনের সুকুমার বৃত্তির চাহিদা যোগাতে ধর্মের প্রভাবে রচিত করা হল এসব প্রণয়কাহিনী। এ সব কাব্যের বিষয় ছিল 'ইসলামের ঐতিহ্যমূলক পুরাণ, ফারসি ও আরবি রচনা। বাংলায় এদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল উর্দু ও হিন্দির মাধ্যমে। দোভাষী রীতির প্রণয়কাব্যের বিষয় বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল পূর্ববর্তী খ্যাতিমান কবিদের আখ্যানভাগ। নিজস্ব কবিপ্রতিভা, সমাজ ও পরিবেশের আলোক 'শায়ের' কবিরা এসব প্রণয় কাব্য রচনা করেছিলেন। ইউসুফ-জুলেখা, লায়লী-মজনু, মধুমালতী, সয়ফুলমুলুক- বদিউজ্জামাল-বিদ্যাসুন্দর, সতীময়না-লোরচন্দ্রানী, গুলে বকাওলী ও চন্দ্রাবতীর মত উৎকৃষ্ট কাব্য ছিল দোভাষী প্রণয়োপাখ্যানের বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ। ড. আহমদ শরীফ এর মতে, "অবশ্য দোভাষী পুঁথির অধিকাংশ উর্দু সাহিত্যের অনুবাদ। বাঙলা তর্জমায় উর্দু ভাষার প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ও বাকভঙ্গি রক্ষা করার ফলে কবিদের পক্ষে অনুবাদ কার্যসহজ হয়েছিল।"[৭]

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য বিচারে দুইটি রূপ গ্রহণযোগ্য এক, রূপকল্প (Form) অর্থাৎ কাব্য শরীর, শরীরের রূপ, আর তার প্রসাধন, ছন্দ ও অলংকার, শব্দ ব্যবহারে চাতুর্য এবং রচনা শৈলী (Diction) শরীর বিবৃত আত্মা অর্থাৎ কাব্যের বিষয়, বিষয় মাহাত্ম্য, বিষয় প্রসঙ্গে, কবির বিশ্বস্ততা, জীবন ও জগতের বিচার, বিষয় বিচারে সন্সয়তা ও তন্ময়তা।'[৮]

রূপকল্পের বিচারে দোভাষী প্রণয়োপাখ্যান ধারার ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী প্রণয়কাব্যের প্রায় সবধারা অনুসৃত হয়েছে। তবে কবিদের প্রতিভার অভাবে কাব্য শরীর বিনির্মাণ কঠিন হয়ে পড়ে।

'আল্লাহ বন্দনা, (হামদ), রসুল বন্দনা (নাত), আসহাব বন্দনা (প্রশস্তি), রাজপ্রশস্তি, পীর-স্তুতি, পৃষ্ঠপোষক স্তুতি, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, কবির বংশ পরিচয়। [৯] ছিল প্রতিটি রোমান্স কাহিনী কাব্যের ভূমিকা অংশ। দোভাষী প্রণয়কাব্যেও শায়েরগণ পূর্ববর্তী কবিদের রীতি অনুসরণ করেছেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'হামদ-নাত' এর পর কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। তবে দোভাষী প্রণয়কাব্যের ভূমিকায় কাব্য শুরুর প্রথমে একটি অধ্যায় হামদ নাত, আহসাব-রাজপ্রশস্তি ও পীরস্তুতি করা হয়েছে।

কাব্যের কাহিনী বিচারে বিবেচনার বিষয়গুলো হল[১০] ক) প্লট বা কাহিণী সংস্থান, খ) চরিত্রাংকন গ) কথোপকথন ঘ) স্থানকাল ঙ) কাহিনী বিধৃত জীবনাদর্শ। এগুলোর আলোকে দোভাষী রীতির প্রণয়কাব্য বিশেণ্ডষণ করা যায়। দোভাষী প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম সার্থক কবি ফকির গরীবুল্লাহ। তিনি ইউসুফ জোলেখা, আমির হামজা (প্রথম অংশ), জঙ্গনামা, সোনাভান ও সত্যপীরের পুঁথি নামে পাঁচটি কাব্য রচনা করেছেন। এরমধ্যে ইউসুফ-জুলেখা ও সোনাভান কাব্য দুটি প্রণয়কাব্য জাতীয়। 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে বক্তা বদর পীর ও শ্রোতা বড়-খাঁ গাজী। আধ্যাত্মিক জীবনের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রচিত।[১০] কবি ফারসি কাব্য অনুসারে এ কাব্য রচনা করেন। কাহিনীর শুরুতে আছে-

Dhaka University Institutional Repository

'বদর বলেন গাজী তোমাকের সমঝাই
ইউসুফ নবীর বাত শোন মেরা ভাই।
-ইউসুফ জোলেখা

কুরআনের কাহিনীর সাথে এ কাব্যের অনৈক্য বিদ্যমান। এ কাব্যে নীতি প্রাধান্য বেশি। আধ্যাত্মতত্ত্ব ও নীতিবোধের আড়ালে কাব্যে মানবীয় চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যে ইউসুফ চরিত্র চিত্রনে ও আল্লাহ্–তায়ালার মহিমা প্রকাশে নীতি প্রাধান্য ও বহু কাল্পনিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। জোলেখার প্রণয়জ্বালা, প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান, ঈর্ষামিশ্রিত অর্ন্তদাহন, প্রতিশোধ–পরায়ণতা জোলেখা চরিত্রকে প্রাণবন্ত করেছে। ইউসুফের রূপবর্ণনায় কবি বলেছেন-

আপনার দেহের রূপ আপনি লাইয়া।
ছুরত করেন পয়দা আপনি বলিয়া।।
ছয়ভাগা রূপ আল্লা আলমে ভেজিল।
তার বিচে চারিভাগ ইউছফেরে দিল।।

কবি দোভাষী রীতির কবি হলেও শিল্প চেতনায় তাঁর মাঝে আছে মধ্যযুগের প্রচলিত কাব্যভাবনার সুস্পষ্ট প্রভাব। তিনি সংস্কৃত অলংকার সমৃদ্ধ কাব্যরীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন জোলেখার রূপ বর্ণনা অংশে। যা কবিকৃতির অনন্য স্বাক্ষর। যেমন-

পূর্ণিমার চাঁদ যেন মুখের ছুরাত।
ত্রিভুবন জিলে দেখি রূপের মুরাত

দুই ঠোঁট যেন কমলের ফুল।
তাহার বদন যেন চাঁদ সমতুল।

Dhaka University Institutional Repository

আবার,

'বুকের কাঁচলি যেন করে ঝিকিমিকি।
চন্দ্র সূর্য্য মেখে যেন হয়ে যায় লুকি।।
অতি ক্ষীণ মাজা তার কে করে রাখানি
চলন খঞ্জন তার দেখে তুলে মনি।'

জোলেখার রূপ বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ, কাহিনী ও কাব্যভাবনায় গরীবুল্লাহ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে দোভাষী রীতির কাব্য হিসেবে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা করেছেন। 'অনৈসর্গিক উপাদানের প্রাচুর্য ও ধর্মীয় বর্ণসংযোগের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার লৌকিক প্রভাব এবং হিন্দু পারিপার্শ্বিকের ছাপ এতে যথেষ্ট আছে।'[১১] যেমন-

'বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার।
অথবা, ভুরু জোড়া যেন কামের কামান॥

মধ্যযুগের অন্যান্য খ্যতিমান কবিদের মত গরীবুল্লাহ 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কবির ভাষা রীতি ও বর্ণনা ছিল অসাধারণ। যেমন-

'খসম থাকিতে হৈল কলঙ্ক আমার।
ধিক ধিক জীবনে মোর আমি সে তোমার।।
গোলামের জ্বালায় দেহ হইয়া গেল কালি।
মাথায় তুলিয়া দিলু কলঙ্কের কালি।।'

'গরীবুল্লাহর কাব্যের ভাষা প্রাণহীন নয়, যাবনী ভাষার মিশ্রণ মাত্রতিরিক্ত শ্রুতিকটু হয়নি।'[১২] সৌন্দর্যজ্ঞান থাকলেও বর্ণনারীতির দুর্বল হবার কারণে শিল্প সৌন্দর্য প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পায়নি। তাছাড়া 'শাহ মোহাম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখার তুলনায় গরীবুল্লাহর ইউসুফ-জোলেখার মান অবনমিত হয়েছে।'

'সোনাভান' গরীবুল্লাহ যুদ্ধকাব্য হলেও তাতে প্রণয় আখ্যান আছে। হজরত আলীর পুত্র হানিফার সাথে বীর নারী সোনাভানের যুদ্ধবৃত্তান্ত এর উপজীব্য। যুদ্ধের মধ্যে দুজনের প্রেম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সোনাভানের সঙ্গে হানিফার যুদ্ধ ও পরাজয় এবং হানিফার তিন পত্নীর সঙ্গে সোনাভানের যুদ্ধ ও পরাজয় হয়। পরে স্ত্রীদের ইচ্ছায় সোনাভান-হানিফার পরিণয় কাব্যের মূল ঘটনা। হিন্দু দেবদেবীর ইসলাম ভীতি কাব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়।

দোভাষী রীতির অন্যতম কবি হলেন সৈয়দ হামজা। 'কেবল কালের দিক থেকে নয়, রচনাশৈলীর উৎকর্ষের দিক দিয়েও গরীবুল্লাহর অনুসারীদের মধ্যে তিনিই দীপ্তমান।'[৯৩] তিনি সংস্কৃতানুগ বিশুদ্ধ বাংলা ও দোভাষী রীতি উভয়ে বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

তাঁর 'মধুমালতী' উপাখ্যান বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র বাংলায় রচিত। কবি গরীবুল্লাহর প্রভাবে তিনি দোভাষী রীতি কাব্য রচনা করেন। কবি হিন্দি কাব্য হতে কাহিনীটি লিখেছিলেন। রোমান্টিক শিল্পকলায় জারিত কাহিনীতে অতিপ্রাকৃতের ঘনঘোর পরিবেশ সৃষ্টিতেই কবি স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করেছেন। তবে কবির রোমান্টিক কল্পনা, কাব্যকলা, সৌন্দর্যবোধের নিরীক্ষা ও ভাষা সৌষ্ঠবে 'মধুমালতী' সমসাময়িক ভাষারীতির ব্যতিক্রমী প্রয়াস। তবু সামগ্রিক বিচারে দোভাষী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য মাফিক অতিরিক্ত আরবি-ফারসি-হিন্দি-উর্দু শব্দে ব্যবহার করেননি। নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি অনায়াসে অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন-

নারীগণ হরষিতে সোনার চিরুনি হাতে
বেড়িয়া বসিল মালতীরে।
সাপিনী জিনিয়া কেশ নানা ছন্দে করে বেশ

Dhaka University Institutional Repository

চূড়া বান্ধে মুকুতার ডোরে।

'জৈগুনের পুঁথি' তাঁর দ্বিতীয় কাব্য। এরেমের বাদশাহজাদী বীরাঙ্গনা জৈগুনের সাথে হানিফার যুদ্ধ বিগ্রহ ও পরিণামে পরিণয় বর্ণনা এই কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যে পরীর আবির্ভাব ও হানিফার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে অপহরণের কথাও আছে। কবি এ কাব্যে ইসলামের পরাক্রমের কথা বলেছেন। কবি সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতনতায় পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন অরাজকতা কবির মনে বেদনা জাগিয়েছিল। কবি বলেছেন-

শরা আদালত কাম রাখিবে বাহাল।
রায়েতের এনছাফ করিবে হামেহাল।।
গরীব কাঙ্গাল লোকে করিবে মেহের।
রওনা না রাখিবে বাত জালেম লোকর।।

ড. আনিসুজ্জামান বলেন, 'গরীবুল্লাহর মতো হামজারও শ্রেষ্ঠ রচনা তার প্রণয়কাব্য। মনে হয় উভয় কবিরই স্বাভাবিক প্রতিভা এই জাতীয় কাব্য রচনার অনুকূল ছিল।'[১৪] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন,-'কাব্যকলা ও কল্পনা-বিলাসে, ভাষা-সৌষ্ঠব ও প্রকাশ ভঙ্গীতে, কবির সৌন্দর্য-বোধ ও সাবলীল ভাবের অভিব্যক্তিতে এবং স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতায় কাব্যখানি (মধুমালতী) হামজার অন্যান্য কাব্য হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।' গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা দোভাষী পুঁথির প্রথম দিককার কবি হিসেবে পূর্ববর্তী ধারায় তারা উভয়ে সিদ্ধহস্ত ছিল। ফলে দোভাষী রীতিতে লিখতে গিয়ে তারা মধ্যযুগীয় কাব্য ধারার প্রতিই বারে বারে ঝুকে পড়েছেন। তবে অলৌকিকতা, কল্পনা, ঘটনা সংস্থান, চরিত্রায়ণে ও শব্দ ব্যবহারে তারা দুজনে দোভাষী রীতির কবি বলে গণ্য হন।

দোভাষী পুঁথির বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের পৌরাণিক ও ঐতিহ্যমূলক কাহিনী। কাব্যগুলো প্রধানত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হত। কাব্যের মাঝে বিভিন্ন রাগের গান প্রদত্ত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত পাঠককে বা শ্রোতাকে আকর্ষণ করার জন্য এ রীতি প্রায় প্রতিটি কাব্যে অনুসৃত হয়েছে। একঘেয়েমী থেকে মুক্তি দিতে কবিগণ 'কাব্যের মধ্যে যমক, তোটক ও চৌপদী ব্যবহার করতেন।'[১৬] উর্দু ও ফারসি পুঁথির অনুকরণে পুঁথিগুলির প্রথমে হাম্‌দ বা আলণ্ডাহর গুণগান এবং নাত বা মহানবীর প্রশংসা করা হত। পুঁথিগুলো ছিল প্রায়ই ফারসি ও উর্দু কাব্যের অনুবাদ। অনুবাদকগণ বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে মূল শব্দেরই শুধু প্রতিবর্ণীকরণ করেছেন মাত্র। তাছাড়া ইসলামী ভাব-গম্ভীর রূপ বজায় রাখার জন্য সচেতনভাবে কাব্যে আরবি-ফারসি, তুর্কি ও হিন্দি শব্দের বহুল ব্যবহার হয়েছে। 'ঢাকার চকবাজার ও কলকাতার বটতলা-উভয় স্থানের প্রকাশিত মুসলমানী পুঁথিই আরবি-ফারসি কেতাবের ন্যায় ডানদিক থেকে বাঁদিকে ছাপা হতো। প্রায় একই আকৃতির পুথিগুলো ছাপা হতো। বেশ বড় বড় হরফে।..এসব পুঁথিতে প্রথমে সাদা অথবা রঙ্গীন কাগজের প্রচ্ছদ থাকতো। চারপাশে ছিল লতাপাতার বর্ডার।" [১৭]

দোভাষী রীতির খ্যাতনামা কবি মোহাম্মদ খাতের। তিনি মোট ১২টি পুঁথি রচনা করেন। তার নিবাস ছিল হাওড়া জেলার বালিয়া পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামে। তিনি 'লাইলী-মজনু', 'মৃগাবতী-যামিনীভান', 'গুল ও হরমুজ' নামে প্রণয়কাব্য রচনা করেছিলেন। এসব কাব্যের কাহিনী ও চরিত্র বিশেণ্ডষণ ছিল গতানুগতিক।

মালে মোহাম্মদের 'ছয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল' দোভাষী প্রণয়োপাখ্যান ধারার কাব্য। 'আলাওলের কাহিনী কাব্যের মিশ্র ভাষারীতি-সংস্করণ' [১৮] এই কাব্যটির রচনাকাল (১৮২৮)- কাব্যের শুরুতে তিনি লিখেছেন-

"এই পুঁথি সায়ের ছিল আগু জমানার।
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার।।
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কসেলণ্ডা।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে অধীন রচে চলিত বাঙ্গালা।।

ছয়ফুল মূলুক- বদিউজ্জামাল

'মালে মোহাম্মদ কাব্যের ভাষায় সারল্য এনেছেন, কিন্তু কাব্যটির আর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেননি।"[১৯]

শায়ের কবি মফিজ উদ্দীনের 'কেচ্ছা আলেফ লায়লা' একটি জনপ্রিয় প্রণয়কাব্য। নয়শ পৃষ্ঠার এই বইয়ের অনেকগুলো সংস্করণ হয়েছিল। 'আলিফ-লায়লার' কাহিনী অনুসারে কাব্যটি লিখিত। কাব্যের কাহিনী- স্ত্রীর ব্যভিচারে বাদশাহ শাহজামান ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতি রাত্রেই একটি করে যুবতীকে বিয়ে করে আর সকালে হত্যা করে। এ অবস্থায় উজির কন্যা শাহেরজাদী স্বেচ্ছায় বাদশাকে বিয়ে করেন এবং বুদ্ধিমত্তায় তাকে আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনেন। নারীর প্রতি সীমাহীন অবিশ্বাস ও হিংসা এ কাব্যে লৌকিক রূপে ধরা পড়েছে। কবির ভাষাসৌকর্য চমৎকার। 'শব্দালংকার ও অর্থালংকার ব্যবহারে সৌন্দর্য সৃষ্টি কোথাও কোথাও সার্থক হয়েছে।"[২০]

আবদুর রহিমের 'গাজী কালু ও চম্পাবতী' কাব্য লৌকিক প্রভাবে রচিত ধর্মচেতনা রূপায়ণের কাব্য। কাব্যের কাহিনী- "বৈরাট নগরের রাজা সেকেন্দার বলিরাজাকে পরাজিত করে তার মেয়ে অজুপাকে লাভ করেন। অজুপা ইসলাম গ্রহণ করে রাণী হন। তার প্রথম পুত্র জুলহাস শিকারে গিয়ে পাতালপুরীতে পৌছে সেখানে বসবাস করেন। দ্বিতীয় পুত্র গাজীর সাথে পরী রাজকন্যা চম্পাবতীর সাক্ষাৎ ও প্রণয় ঘটে। তিনবছর পর চম্পাবতীর দেশে পৌছে। রাজা কন্যাদান করতে চায় না। তখন গাজী তার বাঘ ও কুমির সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে বিজয়ী হন এবং চম্পাবতীকে লাভ করলেন। ফিরতি পথে জুলহাস ও তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পিতৃভূমিতে ফিরে আসেন। 'অতি-প্রাকৃত ঘটনার বাহুল্য আছে কাব্যটিতে।.... রচনারীতি সাধারণ, তবে ভাষা সহজ, কোথাও কোথাও

Dhaka University Institutional Repository

কবিত্বের স্পর্শ আছে। রুচি বিকৃতির সামান্য ছাপ সত্ত্বেও' [২১] কাব্যটি পাঠক কুলে সমাদৃত হয়েছিল।

'রূপজালাল' কাব্য (১৮৭৬) নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর সুবৃহৎ গদ্য-পদ্য রচনা। কাব্যটির ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা। আঙ্গিক বিচারে এ কাব্যকে কোন অভিধায় নামাঙ্কিত করা না গেলেও এটি মূলত প্রণয়োপাখ্যান। 'ভাব, ভাষা, আঙ্গিকে বিচিত্রতার সমাবেশে পূর্ণ ফয়জুন্নেসার "রূপজালাল" গ্রন্থখানিকে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিচিত্র গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। দোভাষী পুঁথির সময়কালে রচিত হলেও কাব্যটি সমসাময়িক কাব্য প্রভাব মুক্ত। রূপকথা, অলৌকিকতা ও যাদুক্রিয়া অনেক স্থানে থাকলেও ফয়জুন্নেসার কাব্যে 'নীতি, আদর্শ, নিয়তি তত্ত্ব, দার্শনিকতা ও রূপকের ব্যঞ্জনা এসেছে বার বার। কবি ব্যক্তি জীবনের আলোকে নিজেকে 'রূপ' এবং স্বামী গাজী চৌধুরীকে 'জালাল রূপে' "রূপজালাল" কাব্য রচনা করেছেন। দোভাষী রীতির কাব্যগুলো ছিল প্রায় সবই গতানুগতিক ও সাহিত্য বিচারে মূল্যহীন। দোভাষী রীতির প্রণয়কাব্যের রচয়িতারা অল্পশিক্ষিত বলে কাব্যে সাহিত্য রস, অলংকারের প্রয়োগ দেখাতে পারেননি। দোভাষী রীতির পুঁথির বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ:

১. আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, তুর্কি প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে কাব্যগুলো রচিত। যেমন- 'আমীর হামজায়' শতকরা প্রায় বত্রিশভাগ বিদেশি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

২. বিষয়বস্তু ইসলামী ঐতিহ্যমূলক এবং চরিত্রগুলো ইসলামের ইতিহাসের কোন প্রসিদ্ধব্যক্তিকে নিয়ে গড়ে ওঠা।

৩. কাব্যের শুরুতে হামদ, নাত, পীর মাহাত্ম্য, রাজপ্রশস্তি, অমাত্য প্রশংসা ও কবির ব্যক্তি পরিচয় লেখা হত।

৪. এসব কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল অলৌকিকতাপূর্ণ, অতিপ্রাকৃতে ভরপুর, অসাধারণ, অস্বাভাবিক, অবাস্তব এবং ধর্মের বিকৃত কাল্পনিক কাহিনী।

৫. নারী সৌন্দর্যের প্রশংসা না থাকলেও নিন্দা করা হয়েছে বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

৬. আদর্শবাদের অভাবে সমকালীন সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন জীবনের রূপায়ণ ঘটেনি।

৭. অনেক কাব্যের ভাষাগত, ছন্দগত ও আলংকারিক দিক খুবই নিম্নমানের ছিল।

এই রীতিতে 'নানা বিষয়ে আড়াইশ/তিনশ' গ্রন্থ রচিত হয়েছে গত দেড়শ বছরের মধ্যে'। আলাওল প্রভৃতির কাব্যগুলোকে বাজার ছাড়া করে এগুলোই।'

এ সময়ের বহুল প্রচারিত প্রণয় কাব্য ও কবিদের সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন, ড. আহমদ শরীফ, ড. এনামুল হক প্রমুখ আলোচনা করেছেন। এসব কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

আবদুল গফ্ফার- নুরবক্ত নওবাহার, শাহ বীরবল চন্দ্রভান, কালু গাজী চম্পাবতী।

আবদুর রহিম- (ময়মনসিংহ-গলাচিপা নিবাসী) -দেল দেওয়ানা, রূপরাজ চন্দ্রাবতী,

শেখ আয়জদ্দিন (হুগলী, বালিয়াপুরের তালপুর নিবাসী) -গোলে আন্দাম,

এরাদত উল্লাহ- গুলে বকাওলী,

আল্লা হামিদ- আমীর সদাগর ও ভেলুয়াসুন্দরী (১৮৭৭)

জোবেদ আলী-মধুমালা,

জহিরুল হক- লায়লী-মজনু,

মনীরুদ্দীন- মাহারু ও মনীরের কেচ্ছা।

মুহম্মদ খাতের- গুলে হরমুজ, মৃগাবতী ও যামিনী ভান,

মুহম্মদ সুলতান- জহর মহরা।

শমসের আলী-গুলে হরমুজ,

দায়মুল্লাহ- গুলে দেওকান্দা।

সেকান্দর আলী বেপারী- গহর বাদশা কলেছা সুন্দরী,

আবদুল করিম- কালুগাজী চম্পাবতী,

নুর মুহম্মদ-মদনকুমার মধুমালা,

কাইমউদ্দীন- চমনবাহার,

সাদেক আলী রংপুরী- লাল বানু শাহ জামাল,

Dhaka University Institutional Repository

মফিজউদ্দিন আহমদ-শ্যামসোহাগীর কেচ্ছা,

মুন্সী হোসেন আলী- প্রেমসতী,

আকবর আলী-জেবলমূলুক শামারোখের পুঁথি,

আজাহার আলী- দেলবর গোলে রওসন।

তথ্য নির্দেশ:

১. ড. কাজী দীন মুহম্মদ- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। পৃ. ২৩১

২. পূর্বোক্ত-পৃ. ২৩৫

৩. ড. আনিসুজ্জামান-মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৯৪

৪. পূর্বোক্ত-পৃ. ৯৮

৫. পূর্বোক্ত- পৃ. ৯৮

৬. ড. আহমদ শরীফ-বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য পৃ. ৪৭৮ ২য় খণ্ড, ঢাকা,

৭. পূর্বোক্ত- পৃ. ৪৮১

৮. আবদুল হাফিজ- বাংলা রোমান্স কাব্য পরিচয়, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা- পৃ. ১৪৬

৯. পূর্বোক্ত- পৃ. ১৪৬

১০. ড. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত-পৃ. ১০২-১০৩

১১. প্রাগুক্ত-পৃ. ১০৪

১২. ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান পৃ. ১৩৬

১৩. ড. আনিসুজ্জামান-পূর্বোক্ত-পৃ. ১০৯

১৪. প্রাগুক্ত-পৃ. ১১৪

১৫. ড. এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য. পৃ. ১৮৬

১৬. ড. কাজী দীন মুহম্মদ-পূর্বোক্ত-পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

১৭. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম-ঢাকার ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, গতিধারা, ঢাকা-পৃ. ১৮০

১৮. ড. আনিসুজ্জামান-পূর্বোক্ত-পৃ. ১১৮

১৯. পূর্বোক্ত- ১১৯

২০. পূর্বোক্ত- পৃ. ১২০

২১. পূর্বোক্ত- পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রণয়োপাখ্যান ধারার কাব্যসমূহে সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগে বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলি ছিল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের কবিগণ ছিলেন শিক্ষিত ও নানা ভাষায় পারদর্শী কিন্তু দোভাষী পুঁথির কবিদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন অল্পশিক্ষিত ও সাহিত্য জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। ফলে বাংলায় এসব পুঁথি অনুবাদ কালে প্রচলিত ভাষা আরোপ করেছিলেন। দোভাষী পুঁথির কাহিনী বিস্তারে কবিরা অলৌকিকতা, কাল্পনিকতা ও পরী-দৈত্যের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। এতে করে কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য অনেকটাই ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবুও সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক না কেন, এসব কাব্যে তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র অনেক ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আরবি-ফারসি কাব্যের উর্দু অনুবাদ থেকে বাংলায় তর্জমা করতে কবিগণ আরব-ইরানের কাহিনী বর্ণনাকালে এদেশের সমাজ ব্যবস্থাকেই কাব্যে তুলে ধরেছেন। কলকাতার বটতলা ও ঢাকার কেতাব পট্টির কল্যাণে এ সময় পুঁথিগুলি ছাপা হত। ড. আহমদ শরীফ বলেন, 'মুসলমান সমাজে তখনো ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেনি বলে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ও প্রয়োজন দেখা দেয় নি। কাজেই স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের চাহিদা মেটানোর জন্য তারা মধ্যযুগের সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় রসে ও আঙ্গিকে রচিত ফরমায়েসী গ্রন্থ ছেপে বাজারে ছাড়তে থাকেন।' দোভাষী রীতির সৃষ্টি ও বিকাশ ভূমি হচ্ছে কলকাতা, হাওড়া ও হুগলীর বন্দর এলাকা। এর বিকাশ ও বিস্তার কাল হচ্ছে ইংরেজ আমল। এ সময় বাংলার মুসলিম সামজে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় তাই এসব কাব্যে ধরা পড়েছে। দোভাষী রীতির কাব্যের কাহিনী গতানুগতিক ও আরবি-ফারসি শব্দবহুল। কবিগণ মূল পুঁথি ও অনুবাদকালে নিজস্ব ভণিতা মনগড়া চরিত্রের নাম বসিয়ে দিয়েছেন। তবুও সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার অনেক তথ্যই ওঠে এসেছে এ রীতির কাব্যে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজকীয় পরিবেশ

মানব জীবনের অবিকল ছবি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যিক বা কবিগণ কাব্য রচনায় সমাজ ও রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে পারেন না। তাছাড়া অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিরতা বিরাজ করেছিল, তাতে এদেশের জনসাধারণ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। মুঘল আমলে এদেশের জনগণ সুখে থাকলেও ইংরেজ শাসন কায়েমের পর থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হলেন শাসন কাঠামো থেকে। তাছাড়া মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও সন্দেহের কারণে ইংরেজরা তাদের ভাল কখনো চায়নি। এমতাবস্থায় বাংলার উঁচু পর্যায়ের মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। সেই সাথে অন্যান্য মুসলমানদের জীবনেও নেমে আসে চরম হতাশা ও ক্ষোভ। হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে উন্নতি বিধান করলেও পলাশীর চক্রান্তের কারণে বাংলার মুসলমানরা কোন ভাবেই ইংরেজ রাজত্বকে মেনে নিতে পারে নি। তেমনিভাবে ইংরেজরাও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হতাশাগ্রস্ত ও সামাজিক ভাবে নিষ্পেষিত বাংলার মুসলমানরা বাঁচার নতুন উপায় খোঁজে। নতুন পথের সন্ধানও ঘটে অলৌকিক ও কাল্পনিক এসব কাহিনী কাব্যে। ছাপাখানার বদৌলতে এসব পুঁথি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। দোভাষী পুঁথিতে বর্ণিত সমাজ ও সংস্কৃতির নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

467390

দোভাষী রীতির প্রতিটি কাব্যের শুরুতে রাজকীয় পরিবেশের বর্ণনা আছে। কারণ সে সময় প্রত্যেক কবি ছিলেন রাজন্য পৃষ্ঠপোষক। তাদের কল্পনার রঙে সে সময়কার রাজকীয় বা জমিদারির পরিবেশকে তারা তুলে ধরেছেন অনায়াসে। এ সব সামন্ত রাজাদের রাজপুরী বিভিন্ন কর্মচারী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত। বিত্তবানদের ঘরে সিহাতখানা থাকত। প্রাসাদের সাথে থাকত সুন্দর বাগান। বাগানে থাকত নানা রকমের ফুল-ফল,

Dhaka University Institutional Repository

পুশ-পাখির সমাহার। সামন্ত রাজাদের ছিল প্রচুর ধনসম্পদ ও সৈন্য। এ সম্পর্কে কাব্যের শুরুতে পাওয়া যায় রাজকীয় পরিবেশ বর্ণনা-

ক) সিপাহী চোরদার কত লেখা কোথা নাই
মাতঙ্গ ঘোটক আদি অধিক অপার
ঘোড়া গাড়ি মেড়া মেড়ি নাহিক শুমার।

[মনির মাহারু সুন্দরী]

খ) উজির নাজির যত সিপাহী চোপদার
দেওয়ান পেশকার নায়ের আছে সিরিস্তায়।

[গোলে আন্দাম]

কাব্যে রাজকীয় পরিবেশ থাকলেও এগুলো ছিল মুসলিম কবিদের চেতনাগত গৌরবজ্জ্বল ঐতিহ্যের অহংকার। কাব্যের বাস্তবতায় তারা এসব আনয়ন করেছিলেন। উচ্চরিত্ত সমাজে যা প্রচলিত ছিল।

সিয়া সাজ সিয়া ঘোড়া আমি বিনে নাই।

[কালু গাজী চম্পাবতী]

জীবন-জীবিকা

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বাণিজ্যিক প্রসারের কারণে মুসলমানরা শহরমুখী হতে থাকে। কলকাতা, হাওড়া ও হুগলীর বিভিন্ন স্থানে তারা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়। ধনবানরা দামী পোশাক পরিধান করতেন। উচ্চবিত্তেরা বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করতেন। পালকী, ডুলি, চলনঘর ছিল সাধারণের বাহন। সমাজে দরিদ্রের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে। জীবন জীবিকার তাগিদে তাদেরকে মরণপণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক) পায়েতে বিলাতী মোজা পিন্দিয়া লইল।
সোনালী জড়িত টুপি শিরে তুলি দিল।।

[ভেলুয়া সুন্দরী]

খ) পুষ্পবাসী তৈল করে মস্তক ধারণ

[জেবলমূলক শামারোখ]

গ) হালুয়া পারাটা আর বিলাতী আঙ্গুর
কিসমিস বাদাম আর আঞ্জির খেজুর
কোরমা কালিয়া আর কাবাব গরম
থরে থরে বহু তরে রকমে রকম।

কর্পূল তাম্বুল খায় করিয়া আমোদ

[জহর মহরা]

পারিবারিক জীবন

পারিবারিক জীবনে পিতাই ছিল গৃহকর্তা : পুত্রলাভ করা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হত। বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। স্নেহপরায়ণ হয়ে সন্তানকে কোলে নেয়া ও চুমু খাওয়া ছিল প্রচলিত রীতি।

মেয়েদের কঠোর অনুশাসন ও অবরোধ প্রথা মেনে চলতে হতো। নিম্নবিত্ত সমাজে মেয়েদের বিশেষ কোন পর্দার ব্যাপার ছিল না। সেকালে রান্নার ব্যাপারে মেয়েদের পারদর্শী হতে হতো। শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মধ্যে ছিল সুসম্পর্ক। বাঙালির বিভিন্ন রকম উপাদেয় খাবারের তালিকা পাওয়া যায়। তাছাড়া নানারকম ফুলও ফলের কথাও বিশেষভাবে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক) গলেতে গজমতি হার দেখিনি গলায়
আক্কেলমন্দে দেখিলে সে হুশহারা হয়।

সেকালে বিচার এই ছিল সর্বস্থান।
চোর চোট্টা পাইলে সবার মারিত গরদান।।

খ) নিরালা ঘরেতে থাকে সখী চারিপাশ।
দেখিতে না পায় কভু জমিন আকাশ।।

গ) তখনি জননী আসি লইলেক কোলে।
কোলে ওঠাইয়া নিল অতিমন সুখে।।

বিবাহ

দোভাষী রীতির প্রতি কাব্যে মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে অল্পবয়সের কথা বলা হয়েছে। বিবাহ পূর্ব প্রেম ছিল সমাজ নিষিদ্ধ। যে কারণে বিবাহ পূর্ব প্রণয় বা সম্ভোগ কোন কাব্যে আসে নি। দুই স্ত্রী নিয়ে একত্রে ঘর করার রীতি সমাজে ছিল। 'হানিফা কয়রাপরী' কাব্যে হানিফার তিনজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তারা পরমানন্দে কয়রাপরীর সাথে হানিফাকে বিয়ে দেয়। সামাজিক রীতির কারণে মজনু গোপন বিয়েতে রাজি হয় নি। কন্যার বিবাহ, গোসল করানো ও গান পরিবেশন ছিল একটি রীতি। ধনবান সমাজ পতিরা নিজেদের খুশিমত জীবন অতিবাহিত করত।

ক) বেলওয়ারি ফানুস শত লেখা জোখা নাই।
মোমের মশাল তাতে দিলেক জালাই।
বাই বাজিগীর কত লাগিল নাচিতে
গায়েনেতে গীত গায় সেতারা বাজায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাই আর নাটুয়া কত নাচিয়া বেড়ায়।।

বাজিকরে বাজি করে আতশের ঝাড়
জোড়ে তাড়ে বাজি ছাড়ে শহর উজার
তোপ গোলা বন্দুক ছাড়য় তাড়াতাড়ি।

খ) বলিলেক উত্তম গঙ্গার জল আনি
গোসল দেহনা মো দুলর্ণ্ভ পরানী।

গ) মন্দিরা করতাল বাজে দোতারা সেতারা
ঢাক ঢোল বাজে কত বাজে নাকাড়া।।
বীণা বেত সারেন্দী বাজায় নানা তাল।
খঞ্জরী ঝাজরী বাজে ভেউর করতাল।।
তবলা নরসিঙ্গা বাজে শব্দ যায় দূর।
বিলাতী বেহালা বাজে শুনিতে মধুর॥

ঘ) তৈল গিলা সোন্দা মেথি একত্রে পিষিয়া।
গোসল দেলায় কন্যা সকলে মিলিয়া॥

ঙ) দোগানা নামাজ দোন করিয়া আদায়।
হাজার শোকর করে খোদার দরগায়॥

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগে মুসলমানরা উচ্চ মানের কাব্য রচনা করেছেন। 'ব্যতিক্রম ছাড়া পুঁথি সাহিত্যের কোন রচনাই মৌলিক নয়; কবিরা ফারসি, উর্দু, হিন্দি ভাষার গ্রন্থ উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তারা অনুবাদের কালে কেবল বিষয়ের অনুকরণ করেননি, মূলের বহু শব্দ, বাক্যাংশ, এমনকি বাক্যরীতিরও অনুসরণ করেছেন। [১]

'কোম্পানী আমলে বাংলার মুসলমানগণ পরাজিত জাতি হিসেবে পীড়ন ও বঞ্চনার স্বীকার হয়ে অচিরে গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এ অবস্থায় শায়ের কবিদের রচিত ইসলামের অতীত গৌরব, শৌর্য, বীর্য, মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যের কাহিনী জাতির মনে আশ্বাস, আনন্দ ও সান্ত্বনার বাণীবহন করে আনে।" [২]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন- বাংলা সাহিত্যের মুসলিম সাধনা (১৯৬৪) গ্রন্থে ২৭০ খানি দোভাষী পুঁথির তালিকা দিয়েছেন। রচয়িতার নাম দেননি। পুঁথি পরিচিতি গ্রন্থে শতাধিক কবির ২০০ পুঁথির তালিকা আছে। অধ্যাপক আলী আহমদকৃত এবং বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত 'মুদ্রিত কলমী পুঁথি' তালিকায় ৫১১ খানি কাব্যের নাম আছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

'উনিশ শতকে রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচীত হয়েছিল, তার সাথে কোন যোগসুত্র না রেখে সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে অবস্থান নিয়ে শায়ের কবিগণ সম্প্রদায়ের মানুষকে বাস্তবতা বিরোধী ও ইহবিমুখ করে একটি স্বপ্নচারী ও কল্পনাবিলাসী জাতিতে পরিণত করে। [৩]

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক গদ্য প্রবর্তিত হলে হিন্দু ও মুসলমানরা এ ভাষা ত্যাগ করে। ইংরেজি, বাংলা, ফার্সি সম্পর্কে কোম্পানীর গৃহীত ভাষানীতি এরূপ পরিবর্তনকে আরো ত্বরান্বিত করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন না ঘটলে হয়তো পুঁথির বাংলাই সর্বসাধারণের ভাষা রূপে গণ্য হত। [৪]

বাংলার এক শ্রেণীর মুসলমান যুগের পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে উনিশ শতক অবধি যে ভাষা ও সাহিত্যিক নিতান্ত মোহবশে অন্তরে লালন করেছে, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়া আজ আর কোন মূল্য নেই। সৃজনশীলতা, মানবভাবনা, ও কাব্যকৃতি না থাকার কারণে এ যুগের পাঠকও তা পাঠ করে না । যুগের প্রয়োজনে পুঁথি সাহিত্যেরও উদ্ভবও বিলয় সাধিত হয়েছে। [৫]

এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি শতকরা নিরানব্বইজন অক্ষর অশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্য চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজকল্যাণ হয় তা হলে মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন ভাবনার নিয়ামক। এ ভাষাও দখিনী উর্দু ও উত্তর ভারতীয় উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা হতে পারত।' [৬]

'দোভাষী শায়েরা প্রাকৃত জনের কবি। তাই পরিশীলিত মানসের শিল্পরুচি সুন্দর ও মহৎ জীবনের মাহাত্ম্যচেতনা কিংবা জীবন জিজ্ঞাসা তাঁদের রচনায় অনুপস্থিত।

'দোভাষী সাহিত স্বধর্মানিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও জাতীয় ঐতিহ্য গর্বী এবং অদ্ভুত কল্পনাপ্রিয় স্বাপ্নিক কবির রচনা, এঁদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার দরুণ নীতিবোধ ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থূলবোধের প্রতিচ্ছবি পাই এদের রচনায়। দেশ, জাতি, ধর্মের ইতিকথা এবং সমাজ সংস্কৃতির একটি স্থূলবোধ ও রূপ এ সাহিত্যে প্রতিফলিত।" [৭]

Dhaka University Institutional Repository

পুঁথি সাহিত্য বহুদিন যাবৎ মুসলিম সাহিত্য রসিকদের রসপিপাসা নিবৃত্ত করে এসেছে। পুঁথি সাহিত্যগুলো মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাহন হয়ে এদেশীয় সাধারণ মুসলমানের চিত্তলোকের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।... তাদের সুখ দুঃখময় জীবনের আনন্দের একমাত্র উপকরণ যেন এই পুঁথি। প্রকৃত পক্ষে, মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুঁথি সাহিত্য এক বিরাট স্থান অধিকার করে আছে।

প্রত্যেক কাব্যে জ্যোতিষের মাধ্যমে ভাগ্য গণনার কথা আছে। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা বিরাজ ছিল। কদমবুচি করা হত বড়দের বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক সমাজে মেনে নিত না। বিধবা বিয়ের ঘোর বিরোধিতা দেখা যায়। পরিবারে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল ছিল। সেকালে রাশি গণনায় মানুষের বিশ্বাস ছিল। রাশি গণনা কারীর নাম ছিল 'নজ্জুম'। সে বিভিন্ন উপায়ে নব জাতক শিশুর ভাগ্য গণনা করে দিত।

সমাজে মন্দ লোকের অভাব ছিল না। হঠকারিতায় একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেত। 'মনির মাহারু সুন্দরী' কাব্যের ২য় বয়ানে শায়ের প্রকাশকের হঠকারিতার কথা তুলে ধরেছেন। সেকালে মেয়েদের আরবি শিক্ষা হত। পিতা মাতার আগ্রহে মেয়েরা ফারসি ও বাংলা শিখত।

বিয়ের অনুষ্ঠানে বাইজীর নাচ, বাদ্যের প্রচলন ছিল। সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ সে সময়কার মানুষদের ছিল প্রবল; ফলে প্রতিটি কাব্যের বয়ান শুরু পূর্বে বিভিন্ন রাগ রাগিনীর সুরে গীত গাওয়া হত।

বিয়ের সময় অন্তঃপুরের নারীরা কনেকে ঘিরে এক ধরনের নাচ ও গান করতেন। কনেকে হলুদ মাখিয়ে গোসল করার সময়ও গান গাওয়া হত।

Dhaka University Institutional Repository

দোভাষী প্রণয়কাব্যে যে সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র ফুটে ওঠেছে তা ছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিচিত্র। মুঘল শাসন আমলের রাজকীয় পরিবেশ কাব্য গুলোতে এসেছে, যা সমসাময়িক নয়, পূর্ববর্তী যুগের। তাছাড়া ঐ সময়কালে মানুষের সুখ বৈভবের পাশাপাশি সীমাহীন দারিদ্র্য, অত্যাচার ও অস্তিত্বহীনতা দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সিপাহী বিপ্লব জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। মোটকথা, ইংরেজ আমল সূচনা হওয়ার পর থেকে বাংলার জনজীবনে সর্বস্তরে হাহাকার চলছিল। কবি মাত্র সমসাময়িক জীবন ও সংস্কৃতিকে ধারণ করলেও দোভাষী পুঁথির কবিরা বাস্তব জীবন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন এদেশের নির্যাতিত মানুষকে। ফলে তারা কাব্যে সচেতনতাকে সমাজ জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ও বাস্তবতাকে পরিহার করে মানুষকে কল্পনার ফানুসে উড়াতে চেয়েছেন। তবুও পারেননি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বাদ দিতে। অসচেতনতা ও মনের তাগিদে প্রয়োগ করেছেন সমাজ ও সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গকে। যা কাব্যকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আধারে পরিণত করল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ:

১। ড. ওয়াকিল আহমদ- বাংলা সাহিত্যের পূরাবৃত্ত, ঢাকা পৃ. ৪২০।

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪।

৬। আহমদ শরীফ- বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৮৯।

৭। প্রাগুক্ত-পৃ. ৪৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন ও উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের পরিধিকাল ১২০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। মধ্যযুগের প্রথম দিকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হয়েছিল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। মুঘল আমলেও সাহিত্যের এ ধারা বহমান থাকে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল রাজবংশের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের প্রভাব বাংলার রাজনীতিকেও আন্দোলিত করে। মুঘল রাজত্বের শেষ পর্যায়ে দুর্বল শাসক, দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতায় ক্রমেই মুঘল সুবাতে স্বাধীন শাসকের উদ্ভব ঘটে। বাংলা সুবাতেও মুর্শিদকুলি খান সুবাদার হিসেবে নামমাত্র অর্থ দিল্লিতে প্রেরণ করে নিজেকে স্বাধীন নবাব হিসেবে পরিগণিত করে। শুরু হয় বাংলায় নবাবী আমল। তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার মসনদে আরোহন করেন এবং দেশের সামগ্রিকস্থিরতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। বিশ্বস্ত সভসদের পরিচালনায় দেশের সব তদারকি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ বিলাস ব্যসনে মত্ত হয়ে পড়েন এবং পূর্বতন সভাসদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। সভাসদের দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রে বিহারের নাযিম আলীবর্দী কর্তৃক তিনি নিহত হন। কারণ সরফরাজ খানের দুর্বল নেতৃত্ব ও বিলাসিতায় দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল। মসনদে আরোহন করে তিনি মারাঠা আক্রমণ, সরফরাজের আত্মীয়ের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মারাঠা বর্গী আক্রমণ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতায় বসে নানান ষড়যন্ত্রের শিকার হন। বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার মধ্য দিয়ে পলাশী যুদ্ধে তাকে পরাজিত করা হয় ও পরে তিনি নিহত হন। অবসান ঘটে নবাবী আমলের; প্রচ্ছন্নভাবে বাংলার রাজশক্তি ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত হয়। মীরজাফর, মীরকাসিম, ও অন্যান্য এদেশীয় ব্যক্তিদের নবাবরূপে বসিয়ে আর্থিকভাবে শোষণ করতে থাকে ইংরেজরা। ১৭৬৫ তে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে উত্থান ঘটে ইংরেজ শক্তির। কারণ এই প্রথম ইংরেজরা বৈধভাবে রাজক্ষমতার অধিকার পেল। ক্লাইভের দ্বৈতশাসনে লাভবান হল ইংরেজরা। আর্থিক প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। এই সুযোগে দিল্লির সম্রাটের বাৎসরিক খাজনা কমাতে লাগল। ইংরেজ বাহিনী প্রমাদ গুনল, বণিক থেকে শাসক হতে। অচিরেই তারা সমগ্র ভারতবর্ষকে করায়ত্ত করল কূটচাল ও সামরিক শক্তিতে।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের প্রতিরোধে কোন শক্তি এগিয়ে এলো না। এভাবে এগিয়ে চলল ইংরেজ কোম্পানির শাসন।

কোম্পানীর শাসনে মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসল। বিশেষ করে মুসলমান সমাজকে বিতড়িত করা হল প্রশাসন থেকে। তাদের লাভজনক অবস্থান থেকে বিচ্যুত করা হল। ক্রমেই মুসলমান সমাজে নেমে আসল অবক্ষয়, হতাশা, ক্ষোভ ও অস্তিত্বহীনতা। চরম নৈরাজ্যে দেশের শিল্প-সাহিত্যেও ভাটা পড়ল। পূর্বে কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিল সামন্ত রাজারা, এই পরিস্থিতিতে পৃষ্ঠপোষকের অভাবে সাহিত্য অধোগতিতে পর্যবসিত হল। মৌলিক অধিকারের সংকটের দিনে রসপিপাসা চরিতার্থে সৃষ্টি হতে থাকল নিম্নমানের কবিগান, পুঁথি সাহিত্য, হাফ, আখড়াই, তরজা, পাঁচালি জাতীয় বিষয়। ইংরেজদের অত্যাচারে নীলচাষ করতে হল, চরম বিপর্যয়েও খাজনা দিতে হল, দেশে মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দিল। তবুও ইংরেজদের হাত থেকে রেহাই পেল না এদেশীয় স্বাধীন মনোভাবীরা। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ইংরেজরা শত্রু মনে করত, আবার মুসলমানরাও ইংরেজদের ঘৃণা করত। ফলে সম্পর্কের দূরত্বে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ রকম চরম সংকটে হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের রসপিপাসা নিবৃত্তি করতে পুরোনো উৎকৃষ্ট প্রণয়কাব্যের স্থলে স্থূল রুচির, অলৌকিক, কাল্পনিক ও শিল্প মূল্যহীন কাব্য রচিত হল প্রচলিত ব্যবহারিক ভাষায়।

ব্যাপকভাবে গৃহীত হল এসব প্রণয়কাব্য। ছাপাখানা স্থাপিত হল। ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর সংখ্যা বাড়তে থাকল। কলকাতার বটতলায় ও ঢাকার চকবাজারে ছেয়ে গেল এসব পুঁথির ছাপাখানা ও দোকান। সারাদেশ থেকে মানুষ আসল এ সব পুঁথি কিনতে। ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে বন্দরে ইসলামী ঐতিহ্যের মূলারক হিসেবে। এটি জনপ্রিয় ধারা হয়ে ওঠল সাহিত্য ক্ষেত্রে। কারণ আরবি-ফারসি উর্দু-হিন্দি তুর্কি মিশ্রিত ভাষায় এটি রচিত হয়েছিল। এ ভাষা-রীতির ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল শহর-

Dhaka University Institutional Repository

বন্দরে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ভাষা রূপের এই ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ক্রমেই এ ভাষারীতির কাব্য নতুন কাব্য ধারা হিসেবে চিহ্নিত হল। ভাষারীতি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলোর নামকরণ ভাষাবিদরা ও কবিরা করলেন, ইসলামী বাংলা সাহিত্য, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মিশ্ররীতির কাব্য, পুঁথি সাহিত্য, ছাপা পুঁথি, এছলামী বাংলা, মুসলমানি বাংলা, দোভাষী পুঁথি হিসেবে। নানান যুক্তি তর্কে সিদ্ধান্ত হল, মিশ্র ভাষার শব্দ নয়, মূলত ফারসি ও বাংলার সৌকর্যে গড়ে উঠেছে এর ভাষা রীতি। কারণ আরবি এসেছে ফারসির মাধ্যমে। আর আরবির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে উর্দু, হিন্দি, তুর্কি শব্দ। অতএব ভাষার আধিক্যের পরিবর্তে মূল অনুসরণ করে এর নামকরণ করা হল "দোভাষী পুঁথি।"

প্রণয়কাব্যধারা পনের শতকে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য দিয়ে শুরু হয়ে আঠার শতক পর্যন্ত বলবত ছিল। তখন এর ভাষা রীতি ছিল সংস্কৃত বহুল। শব্দ ব্যবহারে সাধুরীতির ভাষাভঙ্গিমা; বিষয় ছিল আরবি ফারসি-হিন্দি কাব্যের ঐতিহ্যমূলক পৌরাণিক ও লোকজ কাহিনী। বিদগ্ধ ও শিক্ষিত কবিদের মাধ্যমে রচিত হতে লাগল উৎকৃষ্টকাব্য শ্রেণীর। কিন্তু আঠার শতকের মাঝামাঝিতে শাসন ক্ষমতা 'ইংরেজদের হাতে চলে যাবার পড় সাহিত্য চর্চা রুদ্ধ হয়ে পড়ে সবদিক থেকে। বাংলার মানুষ ইংরেজ শাসন ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কিন্তু পরিত্রাণ পায় না। তাই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা প্রচলিত ভাষারীতির আশ্রয়ে কাব্য রচনায় নেমে পড়ে। দোভাষী পুঁথি আবির্ভাবের পূর্বে উৎকৃষ্ট কাব্যরীতির বেশ কদর ছিল। ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে দোভাষী পুঁথির দিকে নেমে আসল। দোভাষী পুঁথিগুলো ছিল মূলত উর্দু প্রণয়কাব্যের অনুবাদ। কবিরা অনুবাদ করতে গিয়ে নিজস্ব স্বভাব, রুচি, সামাজিক পরিবেশ ও বিভিন্ন ভাষার শব্দ ব্যবহারে কাব্য রচনা করতে থাকলেন। ক্রমেই বিষয়বস্তু ও ভাষারীতিতে প্রবেশ করতে থাকল অলৌকিকতা, কল্পনা প্রবণতা , অশণ্টীলতা, দৈত্য-পরীর আবির্ভাবসহ নানান উপকরণ। ভাষার পরিপাট্যহীনতা, কাহিনীর অসামঞ্জস্যতা, কাব্যে অলংকার প্রয়োগে অপটুতা ও বিষয়বস্তুর একঘেয়েমিত্বে এ ভাষা রীতির কাব্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এ রীতির সর্বাপ্রেক্ষা আকর্ষণীয় ও উৎকৃষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

অংশ হল প্রণয়রীতির কাব্যসমূহ। নর-নারীর প্রেমকে উপজীব্য করে রচিত এসব কাব্য বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে কাব্যগুলি ছিল প্রায় একই রকম। কবিকৃতিতে প্রাগ্রসর ছিলেন ফকির গরীবুল্লাহ , সৈয়দ হামজা, মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, আবদুর রহিম, মুন্সী আয়জদ্দীন, আবদুল গাফফার, এরাদত আলী, শমসের আলী ও সেকান্দর আলী বেপারী প্রমুখ। বিষয়বস্তু ছিল মধ্যযুগীয় কাব্যধারার কাহিনী, আর ভাষারীতি ছিল দোভাষী রীতির।

সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি এসব কাব্যে তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। কারণ অতিলৌকিক, কাল্পনিক, অবাস্তব ও ইসলামী ঐতিহ্যমূলক হওয়ার প্রেক্ষিতে কবিরা সমকালীন জীবনকে আনেননি। সেক্ষেত্রে কবিরা মুসলিম শাসনের অতীত গৌরবময় স্বপ্নচারী পরিবেশ ও প্রতিবেশকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে সমসাময়িক জীবন ও সমাজ সংস্কৃতি কাব্যে তেমন একটা দেখা যায় না। তবে রূপবর্ণনা, বিবাহ, পারিবারিক জীবন, জীবন-জীবিকা ও খাদ্য তালিকায় এদেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার স্পর্শ লাভ করে। পদ্যের স্থলে গদ্য হল নতুন লেখ্যরীতি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে অচিরেই পুরাতন সাহিত্য-আঙ্গিকের পরিবর্তে সৃষ্টি হতে লাগল নতুন আঙ্গিক। সাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন এলো। মানবতা, যুক্তিধর্মিতা, স্বাধীনচেতা ও আদর্শবাদিতা বিষয়াঙ্গিক হিসেবে স্থান পেতে লাগল। সাবলীল ও অনায়াসে মনের ভাব প্রকাশ করা গেল গদ্য সর্বস্বতায়। ইংরেজ শাসন নীতির কারণে ফারসি, ইংরেজি, বাংলা ভাষার কদর বেড়ে গেল বিশেষ করে সরকারি চাকুরি পেতে। তাছাড়া, নতুন গদ্য রীতিতে সাহিত্য পাঠে আনন্দ উপভোগ করতে লাগল সবাই। ধীরে ধীরে প্রসার পেতে থাকল গদ্যের, আর স্তিমিত হতে থাকল দোভাষী কাব্যের। আধুনিক জীবনধারা ও চিন্তা চেতনার প্রতিকূলতায় দোভাষী পুঁথির স্রোতধারা বন্ধ হয়ে যায়। অথচ, আঠার শতকের শেষ পর্যায় থেকে উনিশ শতকের চল্লিশ দশক পর্যন্ত কাব্যগুলি এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, কলকাতা, হুগলী, হাওড়া, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও সুদূর বর্মাতেও পৌঁছে গিয়েছিল। সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামাঞ্চলে রাত জেগে এসব পুঁথি পাঠ করে শোনান হত। মানুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে শুনত এসব পুঁথি। এসব পুঁথির মধ্য দিয়ে মুসলিম জনসাধারণ ইসলাম, ইসলামের আচার-ব্যবহার, শৌর্য-বীর্য ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। দোভাষী রীতির কাব্য প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন-

"কোম্পানী আমলে বাংলার মুসলমানগণ পরাজিত জাতি হিসেবে পীড়ন ও বঞ্চনার স্বীকার হয়ে অচিরে গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এ অবস্থায় শায়ের কবিদের রচিত ইসলামের অতীত গৌরব, শৌর্য, বীর্য, মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যের কাহিনী জাতির মনে আশ্বাস, আনন্দ ও সান্ত্বনার বাণী বহন করে আনে।" যা জাতির জন্য নতুন প্রেরণা দান করে। দোভাষী রীতির যুগপ্রভাব ও গুরুত্ব অনুধাবন প্রসঙ্গে ড. ওয়াকিল আহমদ আরও বলেন যে, "আধুনিক গদ্য প্রবর্তিত হলে হিন্দু ও মুসলমানরা এ ভাষা ত্যাগ করে। ইংরেজি, বাংলা, ফার্সি সম্পর্কে কোম্পানীর গৃহীত ভাষারীতি এরূপ পরিবর্তনকে আরো ত্বরান্বিত করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন না ঘটলে হয়তো পুঁথির বাংলাই সর্ব সাধারণের ভাষা রূপে গণ্য হত।"

ড. আহমদ শরীফ দোভাষী রীতির তাৎপর্য ও ঐতিহ্য অনুভব করে 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন যে, "এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি শতকরা নিরানব্বই জন অনক্ষর অশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্য চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজকল্যাণ হয় তা হলে মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন ভাবনার নিয়ামক। এ ভাষাও দখিনী উর্দু ও উত্তর ভারতীয় উর্দুর মতো একটি মুসলিম ভাষা হতে পারত।"

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

দোভাষী কাব্যসমূহঃ

১. আব্দুল গফফার- নুরবক্ত নওবাহার- বাংলা একাডেমী ছাপা পুঁথি নং-৯।

২. আঃ রহিম- দেল দেওয়ানা বা. এ. ছা. পু. নং ৩১।

৩. আঃ রহিম- কালুগাজী চম্পাবতী- বা. এ. ছা. পু. নং-৬২।

৪. এরাদত উল্লাহ- গুলে বকাউলী- বা. এ. ছা. পু. নং -৪২।

৫. গোলাম মওলা- রওশন জমির- বা. এ. ছা. পু. নং- ৫২৯।

৬. জহিরুল হক- লায়লী মজনু- বা. এ. ছা. পু. নং- ৪৯০।

৭. জোবেদ আলী- মধুমালা- বা. এ. ছা. পু. নং- ৪৯০।

৮. মহম্মদ মুনশী- লায়লী মজনু- বা. এ. ছা. পু. নং- ৫৭।

৯. মালে মুহম্মদ- সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল- বা. এ. ছা. পু. নং -১৮, ১৭০।

১০. মুকাম্মিল খান- মালা খা ও রসন্নেসার পুঁথি- বা. এ. ছা. পু. নং- ২৮।

১১. মুনশী আবদুল ওয়াহাব- লায়লী মজনু- বা. এ. ছা. পু. নং- ২১৭।

১২. মুনশী আশরাফ উদ্দীন- কটু মিঞা ও কর্পুরনেছা কন্যার পুঁথি, বা. এ. ছা. পু. নং -৩৬।

১৩. মুনশী গরীবুল্লাহ- ইউসুফ জোলেখা- বা. এ. ছা. পু. নং -৫৬।

১৪. মুনশী গরীবুল্লাহ- দেলারাম- বা. এ. ছা. পু. নং -২৩।

১৫. মুনশী মুনওয়ার আলী- আলমাছ ও গোলে রায়হান- বা. এ. ছা. পু. নং- ১৪।

১৬. মুনশী রহিমুদ্দিন আহম্মদ- বেহুলা লখীন্দর ও চাঁদ সওদারগারের কেচ্ছা- বা. এ. ছা. পু. নং -৭৩।

১৭. মুয়াজ্জম আলী- ভেলুয়া সুন্দরী- বা. এ. ছা. পু. নং ৬৫, ১৪৫।

১৮. মোজাম্মেল হক- আলিফ লায়লার কেচ্ছা- বা. এ. ছা. পু. নং- ২০৩।

১৯. মোয়াজ্জেম আলী আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।

২০. মোহাম্মদ ফেরাসতুল্লা- হরনুর বিবির কেচ্ছা- বা. এ. ছা. পু. নং- ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

২১. মোঃ রাফিউদ্দীন- জেবলমূলুক শামারোখ- বা. এ. ছা. পু. নং- ৬০।

২২. শেখ আয়েজুদ্দিন- গুলে আন্দাম- বা. এ. ছা. পু. নং -২২।

২৩. শেখ করম উদ্দীন- বেনজীর বদর-ই-মুনীর- বা. এ. ছা. পু. নং- ৩৮২।

২৪. সাদেক আলী রংপুরী- লালবানু শাহজামাল- বা. এ. ছা. পু. নং- ১১৫, ২৩৮।

২৫. সৈয়দ আলী আকবর- জেবলমূলুক শামারোখ- বা. এ. ছা. পু. নং ৩৩৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

২৬. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, কলকাতা- ১৯৬২।

২৭. আজহার ইসলাম- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৮. আনিসুজ্জামান-মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (প্যাপিরাস সংস্করণ)।

২৯. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত)- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সং, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৭।

৩০. আবদুল করিম-বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল, ২য় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭)।

৩১. আবদুল করিম- মোগল রাজধানী ঢাকা, অনুবাদঃ মোহবুল্লাহ ছিদ্দিকী,জুন, ১৯৯৪ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩২. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ(সংকলিত)- পুঁথি পরিচিতি, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ১ম সং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ- বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, জুন ১৯৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা।

৩৪. আবদুল হক চৌধুরী- চট্রগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত)- আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচনাবলি (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

৩৬. আমিনুল ইসলাম- মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৭৬।

৩৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য- বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), কলকাতা।

৩৮. আহমদ শরীফ- বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮, ঢাকা।

৩৯. আহমদ শরীফ- বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

৪০. আহমদ শরীফ- সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, আগামী প্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা।

৪১. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত)- পুঁথি পরিচিতি, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, ঢাকা।

৪২. এম. এ. রহিম- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত) ১ম খণ্ড, এপ্রিল ২০০১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪৩. ওয়াকিল আহমদ-

১। বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত,তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা ২০০৬।

২। বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ৫ম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১।

৩। সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৮।

৪৪. কাজী দীন মুহম্মদ- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা-১৩৭৫।

৪৫. কাজী দীন মুহম্মদ- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৭৫।

৪৬. কাজী রফিকুল হক (সংকলন ও সম্পাদনা)- বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি উর্দু শব্দের অভিধান, ২০০৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. ক্ষুদিরাম দাস- বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি,
দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৪ কলকাতা।

৪৮. ক্ষেত্র গুপ্ত- বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।

৪৯. গোপাল হালদার- বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২য় খণ্ড, ১ম সং,
কলিকাতা ১৩৬৩।

৫০. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া- বাংলার ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস,
জুন, ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫১. গোলাম মুরশিদ- হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ডিসেম্বর ২০১০, ঢাকা।

৫২. জেমস টেলর- কোম্পানী আমলে ঢাকা (অনুবাদ)
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২।

৫৩. দীনেশ চন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৫৬, কলকাতা।

৫৪. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান- বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস,
২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ঢাকা।

৫৫. বাংলাদেশের ইতিহাস- ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ. বি. এম মাহমুদ, ড. সিরাজুল ইসলাম, জুলাই, ২০০৯, (ত্রয়োদশ সংস্করণ, ঢাকা।)

৫৬. ভূদেব চৌধুরী- বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, (১ম পর্যায়),
১ম সংস্করণ, কলিকাতা।

৫৭. মনোয়ারা হোসেন- বাংলা শব্দের শ্রেণী বিচার ও প্রয়োগ বিশেণ্ডষণ,
আগষ্ট ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫৮. মমতাজুর রহমান তরফদার- বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী
হিন্দী পটভূমি, ১ম সংস্করণ, ঢাকা।

৫৯. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম- মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ,
বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬০. মুহম্মদ আবদুল জলিল- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, জানু, ৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬১. মুহম্মদ এনামুল হক- মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, ঢাকা। এনামূল হক রচনা বলী, ১ম ২য় খন্ড ৩য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, বাংলা।

৬২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ- বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, প্রথম মাওলা সংস্করণ, জুলাই, ১৯৯৮, ঢাকা।

৬৩. মুহাম্মদ আবদুল খালেক- মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫।

৬৪. মুহম্মদ আবদুল জলিল- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, নভেম্বর ১৯৮৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬৫. মুহম্মদ ইনাম-উল-হক- বাংলার ইতিহাস ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব, মার্চ, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম- পান্ডুলিপি পাঠ ও পাঠসমীক্ষা, ঢাকা।

৬৭. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম-ঢাকার ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, গতিধারা, ২০০৮ ঢাকা।

৬৮. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা- প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান (১ম খণ্ড), জুন, ২০০৭, বাংলা একাডেমী। ২য় খন্ড, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

৬৯. মো: আবদুল্লাহ্ আল মামুন- ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার, জুন, ২০০৮, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৭০. মোঃ রেজাউল করিম- যশোর জেলায় নীল চাষ নীলকর ও নীলচাষি সম্পর্ক, জুন, ২০১০ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭১. মোঃ হাবিবুর রহমান- সুবা বাংলার ভূ-অভিজাত তন্ত্র, মে ২০০৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৭২. যদুনাথ সরকার- দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭৩. রতন লাল চক্রবর্তী- সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ,ফেব্রু-৯৬, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৭৪. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়- বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, দেজ পাবলিশিং,১৪০২, কলিকাতা।

৭৫. রাজিয়া সুলতানা- আবদুল হাকিম: কবি ও কাব্য. মে. ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭৬. রাজিয়া সুলতানা-সাহিত্য বীক্ষণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭৭. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা: আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগ, পরিবর্বিত সংস্করণ, ১৯৬৩, কলিকাতা।

৭৮. সুকুমার সেন- ইসলামী বাংলা সাহিত্য, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, পৌষ ১৪০০, আনন্দ পাব্লিশার্স,কলকাতা।

৭৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়- বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮) ১৯৬২, কলকাতা

৮০. সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ), ২০০১, ঢাকা।

৮১. হাবিব রহমান- বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, মিত্রম, ২০০৯, কলকাতা।